বাণীবিতান

Recommended the West Bengal Board of Secondary Education as a Text Book on Bengali for Class VI of all Secondary & Junior High Schools of West Bengal & Tripura.
[Vide T. B. No. TB/74/74/BT/225 Dated 24.11.76]

বাণী বিতান

ডঃ মনোরঞ্জন জানা এম. এ., ডি. ফিল (কলি)
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য
বিভাগের প্রধান।

ভোলানাথ প্রকাশনী
৩৭/১১, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯

তৃতীয় মুদ্রন : জানুয়া[illegible]৯৮১

প্রকাশক :
সুরেশ দাস
৩৭/১১, বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ শিল্পী :
বিন্দুভূষণ পাল

অলংকার :
রামকৃষ্ণ দত্ত

মুল্য—৩.০০

যশোদারানী মাইতি
লিপি মুদ্রণ
৩৮, শিবনারায়ণ দাস লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

সূচীপত্র



নদীবক্ষে

—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

উৎসাহ সহকারে আমরা ভ্রমণ করিতে বাহির হইলাম। তখনকার সেই শ্রাবণ মাসের প্রবল স্রোত আমাদের বিপক্ষে ; তাহার প্রতিকূলে অতি কষ্টে, আস্তে আস্তে, চলিতে লাগিলাম ? হুগলী আসিতেই তিন চারি দিন কাটিয়া গেল। আর দুইদিন পরে কালনাতে আসিয়া মনে হইল, যেন কতদূরেই আসিয়াছি।

এইরূপে চলিতে চলিতে পাটুলি পশ্চাৎ করিয়া একদিন বেলা চারিটার সময় আমি রাজনারায়ণবাবুকে বলিলাম, 'আজ তোমার দৈনন্দিন লেখা শেষ করিয়া ফেল। আজ প্রকৃতির শোভা বড়ই দীপ্তি পাইতেছে ; চল আমরা বোটের ছাদের উপর গিয়া বসি।' তিনি বলিলেন যে, 'এখনও বেলার অনেক বাকী, ইহার মধ্যে দৈনন্দিনের জন্য কত ঘটনা ঘটিতে পারে, তা কে জানে ?'

এইরূপে তাঁহার সঙ্গে কথাবার্তা হইতেছে, এমন সময় দেখি, পশ্চিমের আকাশে ঘটা করিয়া একটা মেঘ উঠিতেছে। তখন একটা ভারি ঝড়ের আশঙ্কা হইল। রাজনারাণবাবুকে বলিলাম, 'চল আমরা পিনিসে যাই ; ঝড়ের সময় বোটে থাকা ভাল নয়।'

মাঝি পিনিসের সঙ্গে বোট লাগাইয়া দিল। আমি সিঁড়িতে পা ঝুলাইয়া বোটের ছাদের উপর বসিয়া আছি, এবং দুইজন দাঁড়ী পিনিসের সঙ্গে মিলাইয়া বোট ধরিয়া আছে। অন্য একটা নৌকা গুণ টানিয়া যাইতেছিল, তাহাদের নৌকার গুণ আমাদের বোটের মাস্তুলের আগায় লাগিয়া গেল। সেই গুণ আমাদের একজন দাঁড়ী লগি দিয়া ছাড়াইতেছিল। আমি সেই গুণ ছাড়ান দেখিতেছি। যে দাঁড়ী গুণ ছাড়াইতেছিল, সে সেই বাঁশের লগির ভার সামলাইতে পারিল না। তাহার হাত হইতে লগি আমার মস্তকের উপর পড় পড় হইল। সামাল-সামাল রব পড়িয়া গেল, মহাগোল উঠিল। আমি তখনও সেই মাস্তুলের দিকে তাকাইয়া আছি। দাঁড়ী সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া আমার মস্তক বাঁচাইল বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ সামলাইতে পারিল না। লগির কোণ আসিয়া আমার চক্ষুর কোণে চশমার তারের উপর পড়িল। চক্ষুটা বাঁচিয়া গেল কিন্তু চশমার তার আমার নাসিকা কাটিয়া বসিয়া গেল। আমি টানিয়া চশমা তুলিয়া ফেলিলাম, আর দর দর করিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। ছাদ হইতে নামিয়া তখন আমি নীচে বোটের কিনারায় বসিয়া রক্ত ধুইতে লাগিলাম।

ঝড়ের কথা মনে নাই, সকলেই একটু অসাবধান। দাঁড়ীরা পিনিস ধরিয়া আছে, এবং সেই অবস্থায় বোট লইয়া পিনিস চলিতেছে। এমন সময় একটা দমকা ঝড় আসিয়া পিনিসের মাস্তুলের একটি শাখা ভাঙ্গিয়া ফেলিল। সেই ভগ্ন মাস্তুলটি তাহার পাল দড়াদড়ি লইয়া বোটের মাস্তুলকে জড়াইয়া তাহার ছাদের উপর পড়িল ; সেইখানে আমি পূর্বে বসিয়াছিলাম। এখন তাহা আমার মস্তকের উপর ঝুলিতে লাগিল। পিনিস অবশিষ্ট পাল-ভরে ঝড়ে ছুটিতে লাগিল, এবং বোটকে আকৃষ্ট করিয়া সঙ্গে সঙ্গে লইয়া চলিল। যে দুইজন দাঁড়ি পিনিস ধরিয়া

আছে, তাহারা আর ঠিক রাখিতে পারে না। বোট পিনিসের টানে এক-কেতে হইয়া চলিল ; সে দিকটা জলের সঙ্গে প্রায় মিশিয়াই পড়িল, কেবল এক আঙ্গুল মাত্র জল হইতে ছাড়া। মাস্তলে জড়ান দড়ি কাটিয়া দিবার জন্য একটা গোল পড়িয়া গেল, 'আন্ দা, আন্ দা' ; কিন্তু দা কেহ খুঁজিয়া পায় না। একখানা ভোঁতা দা লইয়া একজন মাস্তলের উপর উঠিল। আঘাতের পর আঘাত, তারপরে আঘাত, কিন্তু এ ভোঁতা দা-য়ে দড়ি কাটে না। অনেক কষ্টে একটা দড়ি কাটিল' দুইটা কাটিল। তৃতীয়টা কাটিতেছে, আমি আর রাজনারায়ণবাবু স্তব্ধ হইয়া জলের দিকে তাকাইয়া আছি। এ নিমিষে আছি, পর নিমিষে আর নাই, জীবন ও মৃত্যু পাশাপাশি। রাজনারায়ণবাবুর চক্ষু স্থির, বাক্য স্তব্ধ, শরীর অসাড়। এদিকে দাঁড়ীরা দড়িই কাটিতেছে। আবার একটা ভারি দম্কা আইল। দাঁড়ীরা বলিয়া উঠিল, 'আবার তাই রে, তাই!' বলিতে বলিতে শেষ দড়িটা কাটিয়া ফেলিল। বোট নিষ্কৃতি পাইয়া তীরের ন্যায় ছুটিয়া একেবারে ওপারে চলিয়া গেল এবং পাড়ের সঙ্গে সমান হইয়া দাঁড়াইল। আমি অমনি বোট হইতে ডাঙ্গায় উঠিয়া পড়িলাম ; রাজনারায়ণবাবুকে ধরাধরি করিয়া তুলিলাম। (সংক্ষেপিত)

অনুশীলনী

১। 'উৎসাহ সহকারে আমরা ভ্রমণ করিতে বাহির হইলাম।'—কাহারা ভ্রমণ করিতে বাহির হইলেন ? তাঁহাদের নাম কর।

২। 'চল, আমরা বোটের ছাদের উপর গিয়া বসি।'—কে কাহাকে বোটের ছাদের উপর গিয়া বসিতে বলিলেন ?

৩। 'ঝড়ের সময় বোটে থাকা ভাল নয়'—কেন ?

৪। লগির কোণ আসিয়া কাহার উপর পড়িল? তাহাতে তাঁহার কি হইল বল।

৫। 'এখন তাহা আমার মস্তকের উপর ঝুলিতে লাগিল।'—কাহার মস্তকের উপর কি ঝুলিতে লাগিল? তাহাতে কি হইল?

(ক) কাহাকে বলে—পিনিস, মাস্তুল, গুণ টানা?

(খ) রাজনারায়ণবাবু কে বল?

৬। শব্দগুলির অর্থ বল :—

প্রতিকূল, পশ্চাৎ, দৈনন্দিন, দীপ্তি, কিনারা, ভগ্ন, স্তব্ধ, নিমিষ, দমকা, নিষ্কৃতি।

৭। শব্দগুলিকে পৃথক পৃথক বাক্যে ব্যবহার কর :—

উৎসাহ; বিপক্ষ, শোভা, আশঙ্কা, শাখা, অবশিষ্ট. আকৃষ্ট, অসাড়।

৮। বিপরীত শব্দ লিখ :—

প্রতিকূল, পশ্চাদ, উৎসাহ, বিপক্ষ, আকৃষ্ট।

৯। উপযুক্ত শব্দ দ্বারা শূন্যস্থান পূর্ণ কর :—

(ক) এ নিমেষে আছি, পর — আর নাই, জীবন ও — পাশাপাশি।

(খ) রাজনারায়ণবাবুর চক্ষু —, বাক্য —, শরীর —।

আমাদের দেশ নদীমাতৃক। নদী ক্ষুদ্র থেকে বৃহতের সঙ্গে সীমা থেকে অসীমের সঙ্গে মিলনের মাধ্যম। এর দুপ্রান্তের রমণীয় রূপমাধুরী আমাদের আকর্ষণ করে। লেখক সেই নদীবক্ষে ভ্রমণের সময় যে সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিলেন তার সুন্দর বিবরণ এখানে দিয়েছেন। যাত্রাপথের বাধাবিঘ্ন এখানে স্পষ্ট হয়েছে।



মানবজাতি

—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

মানব জাতি, বুদ্ধি ও ক্ষমতাতে সকল জন্তু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তাহাদের বুদ্ধি ও বিবেচনাশক্তি আছে ; এজন্য সর্ববিধ জন্তুর উপর আধিপত্য করে। মানুষ, পশুর ন্যায় চারি পায়ে চলে না, দুই পায়ের উপর ভর দিয়া সোজা হইয়া দাঁড়ায়। মানুষের দুই হাত, দুই পা। দুই পা দিয়া ইচ্ছামত সর্বত্র যাতায়াত করিতে পারে। মানুষ দুই হস্ত দ্বারা আহার-সামগ্রীক আহরণ করে, গৃহসামগ্রী ও পরিধান-বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া লয়, এবং গৃহ নির্মাণ করিয়া তাতে বাস করে। গৃহের মধ্যে বাস করে, এজন্য মানুষকে রৌদ্র, বৃষ্টি, ঝড় প্রভৃতিতে ক্লেশ পাইতে হয় না।

মনুষ্যজাতি একাকী থাকিতে ভালবাসে না। তাহারা পিতা, মাতা, ভ্রাতা, স্ত্রী, পুত্র-কন্যা প্রভৃতি পরিবারবর্গের মধ্যগত ও প্রতিবেশী-মণ্ডলে বেষ্টিত হইয়া বাস করে। এরূপও দেখিতে পাওয়া যায়, কোনও

কোনও ব্যক্তি লোকালয় ছাড়িয়া অরণ্যে বাস করে ; কিন্তু তাদৃশ লোক অতি বিরল। অধিকাংশ লোকই গ্রামে ও নগরে পরস্পরের নিকটে বাটী নির্মাণ করিয়া অবস্থিতি করে। যেখানে অল্প লোক বাস করে, তাহার নাম গ্রাম। যেখানে বহু সংখ্যক লোকের বাস, তাহাকে নগর বলে। যে নগরে রাজার বাস অথবা রাজকীয় প্রধান স্থান থাকে, তাহাকে রাজধানী বলে ; যেমন কলিকাতা বাঙ্গলা দেশের রাজধানী।

মনুষ্যেরা গ্রামে ও নগরে একত্র হইয়া বাস করে। ইহার তাৎপর্য এই, তাহাদের পরস্পর সাহায্য হইতে পারিবে ও পরস্পর দেখাশোনাও কথাবার্তায় সুখে কাল যাপন হইবে। যাহারা এইরূপে একত্র বাস করে, তাহাদিগকে অন্যান্যের প্রতিবেশী বলা যায় ; প্রতিবেশীদিগের মধ্যে সর্বদা সদ্ভাব থাকা উচিত, পরস্পর কলহ ও বিবাদ করিলে অসুখের বৃদ্ধি হয়। যে লোক যে দেশে বাস করে, তাহাকে সে দেশের নিবাসী বলে। দেশের সমস্ত নিবাসী লোক লইয়া এক জাতি হয়। পৃথিবীতে নানা দেশ ও জাতি আছে।

লোক মাত্রেরই জন্মভূমিঘটিত এক এক উপাধি থাকে ; ঐ উপাধি দ্বারা তাহাদিগকে অন্য দেশীয় লোক হইতে পৃথক বলিয়া জানা যায়। বাঙ্গালা দেশে আমাদের নিবাস, এই নিমিত্ত আমাদিগকে বাঙ্গালী বলে। এইরূপ উড়িষ্যা দেশের নিবাসী লোকদিগকে উড়িয়া বলে ; মিথিলার নিবাসীদিগকে মৈথিল, ইংলণ্ডের নিবাসীদিগকে ইংরেজ।

মনুষ্য ভিন্ন সকল প্রাণীই কাঁচা বস্তু খাইয়া থাকে। গো, মহিষ, ছাগ প্রভৃতি জন্তুসকল মাঠে কাঁচা ঘাস খায়। সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি শ্বাপদেরা কোনও জন্তু মারিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার কাঁচা মাংস খাইয়া

ফেলে। পক্ষিগণ জীয়ন্ত কীট পতঙ্গ ধরিয়া তৎক্ষণাৎ ভক্ষণ করে। মনুষ্যেরা প্রায় সকল বস্তুই অগ্নিতে পাক করিয়া খায়। ভাল পাক করা হইলে, এই সমুদয় বস্তু সুস্বাদু ও পুষ্টিকর হয়; কাঁচা খাইলে পরিপাক হয় না, পীড়াদায়ক হয়।

প্রাণিগণ যখন স্বচ্ছন্দ-শরীরে আহার বিহার করিয়া বেড়ায়, তখন তাহাদিগকে সুস্থ বলা যায়; আর যখন তাহাদের পীড়া হয়, স্বচ্ছন্দে আহার বিহার করিতে পারে না। সর্বদা শুইয়া থাকে, ঐ সময় তাহাদিগকে অসুস্থ বলে। সময়ে সময়ে অসাবধানতা প্রযুক্ত মনুষ্যের পীড়া হইয়া থাকে। পীড়া হইলে, চিকিৎসকেরা ঔষধ পথ্য প্রভৃতির ব্যবস্থা করেন; সকলেরই ঐ ব্যবস্থা অনুসারে চলা উচিত ও আবশ্যক। যাহারা ঐ ব্যবস্থা অনুসারে চলে, তাহারা অধিক ক্লেশ পায় না, ত্বরায় রোগমুক্ত ও সুস্থ হইয়া উঠে। যাহারা চিকিৎসকের ব্যবস্থায় অবহেলা করে, তাহারা বিস্তর ক্লেশ পায়, এবং তাহাদের মধ্যে অনেকে মরিয়া যায়।

মনুষ্য শৈশবকালে অতি অজ্ঞ থাকে। ক্রমে ক্রমে যত বড় হয়, উপদেশ পাইয়া, নানা বিষয়ে শিখিতে আরম্ভ করে। আমরা এই যে পৃথিবীতে বাস করিতেছি, ইহা কত বড়, ইহার আকার কেমন, শিশুরা তাহার কিছুই জানে না। অধিক কি, তাহাদের কি নাম, কোন্ হাত ডান্, কোন হাত বাঁ, শিখাইয়া না দিলে ইহাও জানিতে পারে না।

বালকেরা সকল বিষয়ে অজ্ঞ বলিয়া, তাহাদিগকে শিক্ষার্থে পাঠশালায় পাঠান হয়। যাহারা বাল্যকালে যত্ন পূর্বক বিদ্যাভ্যাস করে, তাহারা মনের সুখে কালযাপন করে। আর যাহারা বিদ্যাভ্যাসে আলস্য ও অবহেলা করিয়া, কেবল খেলিয়া বেড়ায়, তাহারা মূর্খ হয় ও যাবজ্জীবন দুখ পায়।

(সংক্ষেপিত)

অনুশীলনী

১। মানুষ কেন সকল জন্তুর উপরে আধিপত্য করে ?
২। গ্রাম ও নগর কাহাকে বলে ?
৩। 'মানুষেরা গ্রামে ও নগরে, একত্র হইয়া বাস করে।'—ইহার তাৎপর্য বুঝাইয়া দাও।
৪। মানুষ কিভাবে খাদ্য দ্রব্য গ্রহণ করে ?
৫। 'যাহারা চিকিৎসকের ব্যবস্থায় অবহেলা করে'—তাহাদের দশা কি হয় ?
৬। বালকদিগকে কেন বিদ্যালয়ে পাঠান হয় ?
৭। শব্দগুলির অর্থ বল এবং বাক্য গঠন কর :—
আধিপত্য, আহরণ, পরিধান, বেষ্টিত, অবস্থিত, রাজকীয়, শ্বাপদ, জীয়ন্ত, তৎক্ষণাৎ, ভক্ষণ, সমুদয়, সুস্বাদু, পুষ্টিকর, পীড়াদায়ক, স্বচ্ছন্দ, বিহার, প্রযুক্ত, আবশ্যক, ক্লেশ, তাদৃশ, ত্বরা, অবহেলা, অজ্ঞ, যত্নপূর্বক, যাবজ্জীবন।
৮। বিপরীত শব্দ লিখ :—
উপর, সোজা, প্রস্তুত, ক্লেশ, গ্রাম, সদ্ভাব, কাঁচা, স্বচ্ছন্দ, মুক্ত, অজ্ঞ, মূর্খ, দুঃখ।
৯। উপযুক্ত শব্দ দ্বারা শূন্যস্থান পূর্ণ কর :—
(ক) যেখানে — লোক বাস করে। তাহার নাম গ্রাম।
(খ) যেখানে বহুসংখ্যক লোকের বাস, তাহাকে — বলে।
(গ) প্রতিবেশীদিগের মধ্যে সর্বদা — থাকা উচিৎ।
(ঘ) লোক মাত্রেরই জন্মভূমি ঘটিত এক এক — থাকে।

মানবজাতির ~~জীবনযা~~ শিক্ষণ, আহার্য, বাসস্থান, জীবন-যাত্রা-প্রণালী সম্পর্কে সুন্দরভাবে আলোচনা করা হয়েছে। লেখক খুব সহজভাবে মানুষের সঙ্গে অন্যান্য জীবজন্তুর পার্থক্য আলোচনা করেছেন। এককথায়, এটি মানবজাতির সংক্ষিপ্ত, প্রাঞ্জল ইতিবৃত্ত।



নবকুমার

—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

তীরোপরি আরোহণ করিয়া নবকুমার দেখিলেন যে, যতদূর দৃষ্টি চলে, ততদূর কোথাও বসতির লক্ষণ কিছুই নাই। কেবল বনমাত্র। কিন্তু সে বন, নিবিড় বন নহে ; কেবল স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিদ্ মণ্ডলাকারে কোন কোন ভূমিখণ্ড ব্যাপিয়াছে। নবকুমার তন্মধ্যে আরোহণযোগ্য কাষ্ঠ দেখিতে পাইলেন না। সুতরাং উপযুক্ত বৃক্ষের অনুসন্ধানে তাঁহাকে নদীতট হইতে অধিক দূরে গমন করিতে হইল। পরিশেষে ছেদনযোগ্য একটি বৃক্ষ পাইয়া তাহা হইতে প্রয়োজনীয় কাষ্ঠ সমাহরণ করিলেন। কাষ্ঠ বহন করিয়া আনা আর এক বিষম কঠিন ব্যাপার বোধ হইল ; নবকুমার দরিদ্রের সন্তান ছিলেন না, এ সকল কর্মে অভ্যাস ছিল না ; সম্যক বিবেচনা না করিয়া কাষ্ঠ আহোরণে আসিয়াছিলেন ; কিন্তু এক্ষণে কাষ্ঠভার-বহন বড় ক্লেশকর হইল। যাহাই হউক, যে কর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহাতে অল্প ক্লান্ত হওয়া নবকুমারের স্বভাব ছিল না। এজন্য তিনি কোনমতে কাষ্ঠভার বহিয়া আনিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর

বহেন, পরে ক্ষণেক বসিয়া বিশ্রাম করেন, আবার বহেন ; এইরূপে আসিতে লাগিলেন।

এই হেতু নবকুমারের প্রত্যাগমনে বিলম্ব হইতে লাগিল। এদিকে সঙ্গিগণ তাঁহার বিলম্ব দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইতে লাগিল ; তাহাদিগের এইরূপ আশঙ্কা হইল যে, নবকুমারকে ব্যাঘ্রে হত্যা করিয়াছে। অথচ কাহারও এমন সাহস হইল না যে, তীরে উঠিয়া কিয়দ্দুর অগ্রসর হইয়া তাঁহার অনুসন্ধান করে।

নৌকারোহীগণ এইরূপ কল্পনা করিতেছিল ; ইত্যবসরে জলরাশি-মধ্যে ভৈরব কল্লোল উত্থিত হইল। নাবিকেরা বুঝিল যে,—জোয়ার আসিতেছে। নাবিকেরা জানিত যে, এ সকল স্থানে জলোচ্ছ্বাস কালে তটদেশে এরূপ প্রচণ্ড তরঙ্গাভিঘাত হয় যে, তখন নৌকাদি তীরবর্তী থাকিলে তাহা খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়। এজন্য তাহারা অতি ব্যাস্তে নৌকার বন্ধন মোচন করিয়া নদীমধ্যবর্তী হইতে লাগিল। নৌকামুক্ত হইতে না হইতেই সন্মুখস্থ সৈকত-ভূমি জলপ্লুত হইয়া গেল, যাত্রিগণ কেবল ত্রস্তে নৌকায় উঠিতে অবকাশ পাইয়াছিল, তণ্ডুলাদি যাহা যাহা চরে স্থিত হইয়াছিল তৎসমুদয় ভাসিয়া গেল। দুর্ভাগ্যবশতঃ নাবিকেরা সুনিপুণ নহে ; নৌকা সামলাইতে পারিল না ; প্রবল জল প্রবাহবেগে তরণী রসুলপুর নদীর মধ্যে লইয়া চলিল। একজন আরোহী কহিল, "নবকুমার রহিল যে ?" একজন নাবিক কহিল, "আঃ নবকুমার কি আর আছে ! তাকে শিয়ালে খাইয়াছে !"

জলবেগে নৌকা রসুলপুর নদীর মধ্যে লইয়া যাইতেছে, প্রত্যাগমন করিতে বিস্তর ক্লেশ হইবে, এই জন্য নাবিকেরা প্রাণপণে বাহিরে আসিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। এমন কি, সেই মাঘ মাসে তাহাদিগের ললাটে স্বেদস্রুতি হইতে লাগিল, এইরূপ পরিশ্রম দ্বারা রসুলপুর

নদীর ভিতর হইতে বাহিরে আসিতে লাগিল বটে, কিন্তু নৌকা যেমন বাহিরে আসিল, অমনি তথাকার প্রবলতর স্রোতে উত্তরমুখী হইয়া তীরবৎ বেগে নাবিকেরা চলিল, তাহার তিলার্ধমাত্র সংযম করিতে পারিল না ; নৌকা আর ফিরিল না।

যখন জলবেগ এমত মন্দীভূত হইয়া আসিল যে, নৌকার গতি সংযত করা যাইতে পারে, তখন যাত্রীরা রসুলপুরের মোহনা অতিক্রম করিয়া অনেক দূরে আসিয়াছিলেন। এখন নবকুমারের জন্য প্রত্যাবর্তন করা যাইবে কিনা, এ বিষয়ের মিমাংসা আবশ্যক হইল। তাঁহারা বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে, তথা হইতে প্রত্যাবর্তন করা আর এক ভাঁটার কর্ম। পরে রাত্রি আগত হইবে, আর রাত্রে নৌকা-চালনা হইতে পারিবে না, অতএব পরদিনের জোয়ারের প্রতীক্ষা করিতে হইবে। একাল পর্যন্ত সকলকে অনাহারে থাকিতে হইবে। তুইদিন নিরাহারে সকলের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইবে বিশেষ নাবিকেরা প্রতিগমন করিতে অসম্মত ; তাহারা কথার বাধ্য নহে। তাহারা বলিতেছে যে, নবকুমারকে ব্যাঘ্রে হত্যা করিয়াছে। তাহাই সম্ভব। তবে এত ক্লেশ স্বীকার কি জন্য ?

এইরূপ বিবেচনা করিয়া যাত্রীরা নবকুমার ব্যাতীত স্বদেশে গমনই উচিত বিবেচনা করিলেন। নবকূমার সেই ভীষণ সমুদ্রতীরে বনবাসে বিসর্জিত হইলেন।

ইহা শুনিয়া যদি কেহ প্রতিজ্ঞা করেন, কখনও পরের উপবাস নিবারণার্থে কাষ্ঠহরণে যাইবেন না, তবে তিনি পামর—এই যাত্রীদিগের ন্যায় পামর। আপন উপকারীকে বনবাসে বিসর্জন করা যাহাদিগের প্রকৃতি তাহারা চিরকাল আপন উপকারীকে বনবাস দিবে —কিন্তু যতবার বনবাসিত করুক না কেন, পরের কাষ্ঠহরণ করা

যাহার স্বভাব, সে পুনর্বার কাষ্ঠহরণে : যাইবে। তুমি অধম—তাই বলিয়া আমি উত্তম না হইব কেন ? [সংক্ষেপিত]

অনুশীলনী

১। তীরের উপর উঠিয়া নবকুমার কি দেখিলেন ?

২। 'কাষ্ঠ বহন করিয়া আনা আর এক বিষম কঠিন ব্যাপার বোধ হইল ?' —কাহার পক্ষে, কেন বিষম কঠিন ব্যাপার বোধ হইল ?

৩। নবকুমারের কেন ফিরিতে বিলম্ব হইল ?

৪। নাবিকেরা কেন নৌকা সামলাইতে পারিল না ?

৫। একজন আরোহী কহিল, 'নবকুমার রহিল যে'—ইহার উত্তরে একজন নাবিক কি বলিল ?

৬। 'তবে এত ক্লেশ স্বীকার কি জন্ত ?—এই উক্তিটি কাহার ? কোন অবস্থায় এরূপ বলা হইয়াছিল ?

৭। 'তুমি অধম তাই বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন ?' ইহার দ্বারা চরিত্রটি সম্বন্ধে কি ধারনা হয় ?

৮। নবকুমার একাকী কাঠ সংগ্রহ করতে গেলেন কেন ? ইহার দ্বারা চরিত্রটি সম্বন্ধে কি ধারণা হয় ?

৯। শব্দগুলির অর্থ বল এবং বাক্য গঠন কর :—

আরোহী, মণ্ডলাকার, তন্মধ্যে, অনুসন্ধান, পরিশেষে, ছেদনযোগ্য, সমাহরণ, সম্যক, কিয়দ্দূর, প্রত্যাগমন, বিলম্ব, উদ্বিগ্ন, আশঙ্কা, ইত্যবসরে, ভৈরব, কল্লোল, জলোচ্ছাস, তরঙ্গাভিঘাত, সৈকত, জলপ্লুত, তণ্ডুল, মন্দীভূত, বিসর্জিত, নিবারণার্থে, পামর।

১০। সন্ধি বিচ্ছেদ কর :—

তীরোপরি মণ্ডলাকার, প্রত্যাগমন, কিয়দ্দূর, তরঙ্গাভিঘাত, কাষ্ঠাহরণ।

১১। প্রত্যেকটি শব্দের (তিনটি করিয়া) সমনাম বল :—

বন, ভূমি, তরঙ্গ, নৌকা, সমুদ্র।

উদ্ভিদের সাড়া



—জগদীশচন্দ্র বসু

আমাদের কোন অঙ্গে আঘাত করিলে সেখানে একটা বিকারের ভাব উৎপন্ন হয়। তাহাতে অঙ্গ সংকুচিত হয়। বৃক্ষকে তার দিয়া বৈদ্যুতিক কলের সঙ্গে সংযোগ করিলে দেখা যায় যে, গাছকে আঘাত করিবামাত্র সে একটা বৈদ্যুতিক সাড়া দেয়। এইরূপে সকল প্রকার গাছ এবং তাহার প্রত্যেক অঙ্গ-প্রতঙ্গে আঘাত অনুভব করিয়া যে সাড়া দেয়, তাহা প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছি।

কোন কোন গাছ আছে যাহারা নাড়িয়া সাড়া দেয়, যেমন লজ্জাবতী লতা। মানুষকে যেরূপ উত্তেজিত করা যায়, লজ্জাবতীকে ঠিক সেই প্রকারে—যেমন লাঠির আঘাত দিয়া, চিমটি কাটিয়া, উত্তপ্ত লোহার ছ্যাঁকা দিয়া, অ্যাসিডে পুড়াইয়া উত্তেজিত করা যাইতে পারে। এই সকল নাড়া পাইয়া পাতা সাড়া দেয়। তবে এই

এখন কঠিন সমস্যা এই যে, কি করিয়া গাছের সাড়া লিপিবদ্ধ করা যাইতে পারে। জন্তুর সাড়া সাধারণতঃ কলম সংযোগে লিপিবদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু চড়ুই পাখীর লেজে কুলা বাঁধিলে তাহার উড়িবার যেরূপ সাহায্য হয়, গাছের পাতার সহিত কলম বাঁধিলে তাহার লিখিবার সাহায্যও সেইরূপ হইয়া থাকে। এমনকি বনচাঁড়ালের ক্ষুদ্র পত্র সূতার ভার পর্যন্তও সহিতে পারে না; সুতরাং সে যে কলম ঠেলিয়া সাড়া লিখিবে এরূপ কোন সম্ভাবনা ছিল না। এজন্য আমি অন্য উপায় গ্রহণ করিয়াছিলাম। আলো-রেখার কোনো ওজন নাই। প্রথমতঃ প্রতিবিম্বিত আলো-রেখার সাহায্যে আমি বৃক্ষপত্রের বিবিধ লিপিভঙ্গী স্বহস্তে লিখিয়া লইয়াছিলাম। ইহা সম্পাদন করিতেও বহুবৎসর লাগিয়াছিল। যখন এই সকল নূতন কথা জীবতত্ত্ববিদ্‌দিগের নিকট উপস্থিত করিলাম তখন তাঁহারা যারপর নাই বিস্মিত হইলেন। পরিশেষে আমাকে জানাইলেন যে, এই সকল তত্ত্ব এরূপ অভাবনীয় যে যদি কোনদিন বৃক্ষ সহস্তে লিখিয়া সাক্ষ্য দেয়, কেবল তাহা হইলেই তাঁহারা এরূপ নূতন কথা মানিয়া লইবেন।

যেদিন এ সংবাদ আসিল সেদিন সকল আলো যেন আমার চক্ষে নিবিয়া গেল। কিন্তু পূর্ব হইতেই জানিতাম— সফলতা, বিফলতারই উল্টা পিঠ। এ কথাটা আবার নূতন করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিলাম। বার বৎসর পর সাপই বর হইল। সেই বার বৎসরের কথা সংক্ষেপে বলিব। পূর্বের কলটি সম্পূর্ণ নূতন করিয়া গড়িলাম। অতি সূক্ষ্ম তার দিয়া একান্ত লঘু ওজনের কলম প্রস্তুত করিলাম। সে কলমটিও মরকত নির্মিত জুয়েলের উপর স্থাপিত হইল, যেন পাতার একটু টানেই লেখনী সহজে ঘুরতে পারে। এতদিন পর বৃক্ষপত্রের স্পন্দনের সহিত

লেখনী স্পন্দিত হইতে লাগিল। তাহার পর লিখিবার কাগজের ঘর্ষণের বিরুদ্ধে কলম আর উঠিতে পারিল না। কাগজ ছাড়িয়া মসৃণ কাচের উপর প্রদীপের কৃষ্ণ কাজল লেপিলাম। কৃষ্ণ লিপিপটে শুভ্র লেখা হইল। ইহাতে ঘর্ষণের বাধাও অনেকটা কমিয়া গেল ; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও গাছের পাতা সেই সামান্য ঘর্ষণের বাধা ঠেলিয়া কলম চালাইতে পরিল না। ইহার পর অসম্ভবকে সম্ভব করিতে আরও পাঁচ-ছয় বৎসর লাগিল। তাহা আমার "সমতল" যন্ত্রের উদ্ভাবন দ্বারা সম্ভাবিত হইয়াছে। এই সকল কলের দ্বারা বৃক্ষের বহুবিধ সাড়া লিখিত হয়। বৃক্ষের বৃদ্ধি মুহূর্তে নির্ণীত হয় এবং এইরূপে তাহার স্বতঃস্পন্দন লিপিবদ্ধ হয় এবং জীবন ও মৃত্যু-রেখা তাহার আয়ু পরিমাণ করে। [সংক্ষেপিত]

অনুশীলনী

১। 'তাহা প্রমাণ করতে সমর্থ হইয়াছি।'—কে, কি প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ?

২। কি ভাবে 'গাছের সাড়া লিপিবদ্ধ' করা যায় বল।

৩। 'এজন্য আমি অন্য উপায় গ্রহণ করিয়াছিলাম।'—কে কিজন্য অন্য উপায় গ্রহণ করিয়াছিলেন ?

৪। যেদিন এ সংবাদ আসিল সেদিন সকল আলো যেন আমার চক্ষে নিবিয়া গেল।'—এখানে আমি কে ? কোন্ সংবাদের কথা এখানে বলা হইয়াছে ?

৫। 'সফলতা বিফলতারই উল্টা পিঠ। এ কথাটা আবার নূতন করিয়া

বুঝিবার চেষ্টা করিলাম।'—কে বুঝিবার চেষ্টা করিলেন? কিভাবে বুঝিতে পারিলেন?

৬। 'সেই বার বৎসরের কথা সংক্ষেপে বলিব।'—তোমার নিজের ভাষায় বুঝাইয়া বল।

৭। কি বল:—লজ্জাবতী, বনচাঁড়াল, প্রতিবিম্বিত, আলোরেখা, সমতল, যন্ত্র।

৮। শব্দগুলির অর্থ বল:—

বিকার, উৎপন্ন, সঙ্কুচিত, সমর্থ, উত্তেজিত, তাড়না, লিপিবদ্ধ, সম্ভাবনা, সম্পাদনা, লিপিপট, উদ্ভাবন, স্বতঃ।

৯। বিপরীত শব্দ বল:—সঙ্কুচিত, সংযোগ, ক্ষুদ্র, সরলতা, সূক্ষ্ম, লঘু, মসৃণ, সম্ভব, জীবন।

১০। উপযুক্ত শব্দ দ্বারা শূন্যস্থান পূর্ণ কর:—

(ক) আমাদের কোন অঙ্গে আঘাত করিলে সেখানে একটা — ভাব উৎপন্ন হয়। (খ) গাছকে আঘাত করিবামাত্র সে একটা — সাড়া দেয়। (গ) প্রথমতঃ — আলো রেখার সাহায্যে আমি বৃক্ষ পত্রের বিবিধ — সংস্কে লিখিয়া লইয়াছিলাম। (ঘ) অতি সূক্ষ্ম তার দিয়া একান্ত লঘু ওজনের — প্রস্তুত করিলাম।

~~গাছের সাড়া লিপিবদ্ধ করার জন্য~~

জড় বৃক্ষেরও যে প্রাণ আছে, সুখদুঃখানুভূতি আছে, জন্ম-বৃদ্ধি-মৃত্যু আছে, যন্ত্রের সাহায্যে প্রত্যক্ষভাবে তাই জগদীশচন্দ্র ~~তিনি~~ প্রমাণ করলেন, গাছের সাড়া লিপিবদ্ধ করার জন্য লেখক যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া গ্রহণ করেছেন তা আমাদের বৈজ্ঞানিক কৌতূহল বাড়ায় এবং ~~আমরা~~ লেখকের আন্তরিকতা, অধ্যবসায় ও বৈজ্ঞানিক সত্যসন্ধিৎসার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে প্রণোদিত করে।

স্বাদেশিকতা

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জ্যোতিদাদার উদ্যোগে আমাদের একটি সভা হইয়াছিল। বৃদ্ধ রাজনারায়ণবাবু ছিলেন তাহার সভাপতি। ভারতবর্ষের একটা সার্বজনীন পরিচ্ছদ কী হইতে পারে এই সভায় জ্যোতিদাদা তাহার নানাপ্রকারের নমুনা উপস্থিত করিতে আরম্ভ করিলেন। ধুতিটা কর্মক্ষেত্রের উপযোগী নহে অথচ পায়জামাটা বিজাতীয়, এইজন্য তিনি এমন একটা আপোষ করিবার চেষ্টা করিলেন যেটাতে ধুতিও ক্ষুণ্ণ হইল, পায়জামাও প্রসন্ন হইল না। অর্থাৎ তিনি পায়জামার উপর একখণ্ড কাপড় পাট করিয়া একটা স্বতন্ত্র কৃত্রিম মালকোঁচা জুড়িয়া দিলেন। শোলার টুপির সঙ্গে পাগড়ীর মিশাল করিয়া এমন একটা পদার্থ তৈরী হইল যেটাকে অত্যন্ত উৎসাহী লোকও শিরোভূষণ বলিয়া গণ্য করিতে পারে না। এইরূপ সার্বজনীন পোষাকের নমুনা সর্বজনে গ্রহণ করিবার পূর্বেই একলা নিজে ব্যবহার করিতে পারা যে-সে লোকের সাধ্য নহে। জ্যোতিদাদা অম্লান বদনে এই কাপড় পরিয়া মধ্যাহ্নের প্রখর আলোকে গাড়ীতে গিয়া উঠিতেন—আত্মীয় এবং বান্ধব, দ্বারী এবং সারথি সকলেই অবাক হইয়া তাকাইত, তিনি ভ্রূক্ষেপ মাত্র করিতেন না।

আমাদের দলের মধ্যে একটি মধ্যবিত্ত জমিদার ছিলেন। তিনি নিষ্ঠাবান হিন্দু। তাঁহার গঙ্গার ধারে একটি বাগান ছিল। সেখানে

গিয়া আমরা সকল সভ্য একদিন জাতিবর্ণ নির্বিচারে আহার করিলাম। অপরাহ্ণে বিষম ঝড়। সেই ঝড়ে আমরা গঙ্গার ঘাটে দাঁড়াইয়া চিৎকার শব্দে গান জুড়িয়া দিলাম। রাজনারায়ণবাবুর কণ্ঠে সাতটা সুর যে বেশ বিশুদ্ধভাবে খেলিত তাহা নহে, কিন্তু সূত্রের চেয়ে ভাষ্য যেমন অনেক বেশী হয় তেমনি তাঁহার উৎসাহের তুমুল হাতনাড়া তাঁহার ক্ষীণ কণ্ঠকে বহুদূরে ছাড়াইয়া গেল; তালের ঝোঁকে মাথা নাড়িতে লাগিলেন এবং তাঁহার পাকা দাড়ির মধ্যে ঝড়ের হাওয়া মাতামাতি করিতে লাগিল। অনেক রাত্রে গাড়ি করিয়া বাড়ি ফিরিলাম। তখন ঝড় বাদল থামিয়া তারা ফুটিয়াছে। অন্ধকার নিবিড়, আকাশ নিস্তব্ধ, পাড়াগাঁয়ের পথ নির্জন, কেবল দু'ধারের বনশ্রেণীর মধ্যে দলে দলে জোনাকি যেন নিঃশব্দে মুঠা মুঠা আগুনের হরির লুঠ ছড়াইতেছে।

স্বদেশে দিয়াশলাই প্রভৃতির কারখানা স্থাপন করা আমাদের সভার উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি ছিল। এজন্য সভ্যেরা তাহাদের আয়ের দশমাংশ এই সভায় দান করিতেন। দিয়াশলাই তৈরী করিতে হইবে তাহার কাঠি পাওয়া শক্ত। অনেক পরীক্ষার পর বাক্স কয়েক দিয়াশলাই তৈরী হইল। ভারত-সন্তানের উৎসাহের নিদর্শন বলিয়াই যে তারা মূল্যবান তাহা নহে—আমাদের এক বাক্সে যে খরচ পড়িতে লাগিল তাহাতে একটা পল্লীর সম্বৎসরের চুলো ধরানো চলিত। আরো একটু সামান্য অসুবিধা এই হইয়াছিল যে নিকটে অগ্নিশিখা না থাকিলে তাহাদিগকে জ্বালাইয়া তোলা সহজ ছিল না। দেশের প্রতি জ্বলন্ত অনুরাগ যদি তাহাদের জ্বলনশীলতা বাড়াইতে পারিত তবে আজ পর্যন্ত তাহারা বাজারে চলিত।

খবর পাওয়া গেল একটি কোনো অল্পঅল্পবয়স্ক ছাত্র কাপড়ের কল

তৈরী করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত; গেলাম তাহার কল দেখিতে। সেটা কোন কাজের জিনিস হইতেছে কিনা তাহা কিছুমাত্র বুঝিবার শক্তি আমাদের কাহারও ছিল না; কিন্তু বিশ্বাস করিবার ও আশা করিবার শক্তিতে আমরা কাহার চেয়ে খাটো ছিলাম না। যন্ত্র তৈরী করিতে কিছু দেনা হইয়াছিল, আমরা তাহা শোধ করিয়া দিলাম। অবশেষে একদিন দেখি ব্রজবাবু মাথায় একখানা গামছা বাঁধিয়া জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত। কহিলেন, আমাদের কলে এই গামছার টুকরো তৈরী হইয়াছে। বলিয়া দুই হাত তুলিয়া তাণ্ডব নৃত্য!— তখন ব্রজবাবুর মাথার চুলে পাক ধরিয়াছে।

ছেলেবেলায় রাজনারায়ণবাবুর সঙ্গে যখন আমাদের পরিচয় ছিল তখন সকল দিক হইতে তাঁহাকে বুঝিবার শক্তি আমাদের ছিল না তখনই তাঁহার চুল দাড়ি প্রায় সম্পুর্ণ পাকিয়াছে কিন্তু আমদের দলের মধ্যে বয়সে সকলের চেয়ে যে ব্যক্তি ছোটো তাহার ও তাঁহার বয়সের কোন অনৈক্য ছিল। এমন কি প্রচুর পাণ্ডিত্যেও তাঁহার কোন ক্ষতি করিতে পারে নাই, তিনি একেবারেই সহজ মানুষটির মতোই ছিলেন। জীবনের শেষ পর্যন্ত অজস্র হাস্যোচ্ছ্বাস কোনো বাধাই মানিল না—না বয়সের গাম্ভীর্য, না স্বাস্থ্য, না সংসারের দুঃখকষ্ট, কিছুতেই তাঁহার হাসির বেগটাকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে নাই। একদিকে তিনি আপনার জীবন এবং সংসারটিকে ঈশ্বরের কাছেসম্পূর্ণ নিবেদন করিয়া দিয়াছিলেন আর একদিকে দেশের উন্নতি সাধন করিবার জন্য তিনিই সর্বদাই কত রকম সাধ্য ও অসাধ্য প্লান্ করিতেন তাহার আর অন্ত নাই। রিচার্ডসনের তিনি প্রিয় ছাত্র, ইংরাজী বিদ্যাতেই বাল্যকাল হইতে তিনি মানুষ, কিন্তু তবু অভ্যাসের সমস্ত বাধা ঠেলিয়া ফেলিয়া বাংলাভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে পূর্ণ উৎসাহ ও

শ্রদ্ধার বেগে তিনি প্রবেশ করিয়াছিলেন। এদিকে তিনি মাটির মানুষ কিন্তু তেজে একেবারে পরিপূর্ণ ছিলেন।

দেশের প্রতি তাঁহার যে প্রবল অনুরাগ, সে তাঁহার সেই তেজের জিনিষ। দেশের সমস্ত খর্বতা দীনতা অপমানকে তিনি দগ্ধ করিয়া ফেলিতে চাহিতেন। তাঁহার দুই চক্ষু জ্বলিতে থাকিত, তাঁহার হৃদয় দীপ্ত হইয়া উঠিত, উৎসাহের সঙ্গে হাত নাড়িয়া আমাদের সঙ্গে মিলিয়া গান ধরিতেন—গলায়সুর লাগুক আর না লাগুক, সে তিনি খেয়ালই করিতেন না।

এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন,
এক কার্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন।

অনুশীলনী

১। 'ভারতবর্ষের একটা সার্বজনীন পরিচ্ছদ কী হইতে পারে'—জ্যোতিদাদা তাহার কি কি নমুনা উপস্থিত করিয়াছিলেন বল। সেই পোষাকগুলির নমুনা দাও।

২। 'সেই ঝড়ে আমরা গঙ্গার ঘাটে চিৎকার শব্দে গান জুড়িয়া দিলাম।'—কোন্ ঝড়ে কাহারা কোথায় কিভাবে গান জুড়িয়া দিল?

৩। স্বদেশে দিয়াশালাই কারখানা স্থাপনের বিবরণ দাও।

৪। 'আমাদের কলে এই গামছার টুকরো তৈরী হইয়াছে।'—কাহাদের কলে কিরূপ গামছা তৈরী হইয়াছিল বল।

৫। 'তিনি একেবারে সহজ মানুষটির মতোই ছিলেন।'—এই 'তিনি' কে? এই সহজ মানুষটির পরিচয় দাও।

৬। কে বল—জ্যোতিদাদা, রাজনারায়ণবাবু, ব্রজবাবু, রিচার্ডসন।

৭। শূন্যস্থানগুলি উপযুক্ত শব্দ দ্বারা পূর্ণ কর :—
অন্ধকার — আকাশ —, পাড়াগাঁয়ের পথ —, কেবল দু'ধারের বনশ্রেণীর মধ্যে দলে দলে — যেন — মুঠা মুঠা আগুনের — লুঠ ছড়াইতেছে।

৮। শব্দগুলি বাক্যে ব্যবহার কর :—
(ক) চলিত ভাষায় :—আপোস, মিশাল, তুমুল, ঝোঁক।
(খ) সাধু ভাষায় :—স্বতন্ত্র, প্রখর, অম্লান, নিদর্শন।

বাঙালীর অতিথিসেবা

—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সন্ধ্যা শেষ হইল, কিন্তু রাত্রির অন্ধকার গাঢ়তর হইয়া উঠিতে এখনও বিলম্ব ছিল। এই সময়টুকুর মধ্যে যেমন করিয়া হোক আশ্রয় একটা ঘুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।

মিনিট দশেক হাঁটিয়া চক্রবর্তীর বহিরবাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আমার পথপ্রদর্শক ডাক দিয়া কহিল, 'ঠাকুর মশাই, ঘরে আছেন?'

কোন সাড়া আসিল না। ভাবিয়াছিলাম কোন্ সম্পন্ন ব্রাহ্মণ-বাটীতে আতিথ্য লইতে চলিয়াছি, কিন্তু ঘর-দ্বারের শ্রী দেখিয়া মনটা দমিয়া গেল। ওদিকে সাড়া নাই, এদিকে আমার সঙ্গীর অধ্যবসায়ও অপরাজেয়। সে ডাকের উপর ডাক দিতে লাগিল।

হঠাৎ জবাব আসিল, 'যা যা, আজ যা। যা বলছি।' লোকটি কিছুমাত্র বিচলিত হইল না, প্রত্যুত্তরে কহিল, 'কে এসেছে বা'র হ'য়ে দেখুন না।' কিন্তু বিচলিত হইয়া উঠিলাম আমি; যেন চক্রবর্তীর পরমপূজ্য গুরুদেব গৃহ পবিত্র করিতে অকস্মাৎ আবির্ভূত হইয়াছি।

নেপথ্যে কণ্ঠস্বর মুহূর্তে মোলায়েম হইয়া উঠিল, 'কে রে, ভীম?' বলিতে বলিতে গৃহস্বামী দ্বারপথে দেখা দিলেন। পরনের বস্ত্রখানি উঠিল। র এবং অতিশয় ক্ষুদ্র, অন্ধকারপ্রায় সন্ধ্যার ছায়ায় তাঁহার বয়স শোবার জায়গা দিত পারিলাম না, কিন্তু খুব বেশী বলিয়াও মনে হইল না। ক'রে দেব।" কিন্তু আশ্চর্লন, 'কে রে, ভীম?' বুঝিলাম আমার সঙ্গীর

নাম ভীম। ভীম বলিল, 'ভদ্দর লোক, বামুন। পথ ভুলে হাসপাতালে গিয়ে হাজির। আমি বললাম, 'ভয় কি, চলুন না ঠাকুর-মশায়ের বাড়ীতে রেখে আসি, গুরু-আদরে থাকবেন'।" বস্তুতঃ ভীম অতিশয়োক্তি করে নাই; চক্রবর্তী আমাকে পরম সমাদরে গ্রহণ করিলেন। এবং স্বহস্তে মাদুর পাতিয়া বসিতে দিলেন।

সহসা অন্তরাল হইতে তীক্ষ্ণ কঠোর প্রশ্ন আসিল, হাঁ গা, কে মানুষটি এলো?'

অনুমান করিলাম, ইনিই গৃহিণী। জবাব দিতে চক্রবর্তীরই শুধু গলা কাঁপিল না, আমারও যেন হৃৎকম্প হইল। তিনি তাড়াতাড়ি বললেন, 'মস্ত লোক গো, মস্ত লোক! অতিথি—ব্রাহ্মণ—নারায়ণ! পথ ভুলে এসে পড়েছেন,—শুধু রাত্তিটা,—ভোর না হ'তেই আবার সকালেই চ'লে যাবেন।

ভিতর হইতে জবাব আসিল, হাঁ সবাই আসে পথ ভুলে, ঘরে না আছে একমুঠো চাল, না আছে একমুঠো ডাল—খেতে দেবে কি? চক্রবর্তী কহিলেন, 'আহা, কি যে বল তুমি! আমার ঘরে আবার চাল-ডালের অভাব! চল চল, ভেতরে চল, সব ঠিক ক'রে দিচ্চি।'

অতিথিসৎকার লইয়া স্বামী-স্ত্রীতে আলাপ শুরু হইল। তাহার ভাষাও যেমন, গভীরতাও তেমনি। আমি ব্যাকুল হইয়া একবার উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতেই চক্রবর্তী সজোরে আমার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন—'অতিথি, নারায়ণ! বিমুখ হ'য়ে গেলে গলায় দড়ি দেব।'

মুহূর্ত কয়েক পরে ভিতর হইতে শুধু একখানি হাত বা[illegible] দুম্ করিয়া একটা পিতলের ঘড়া দিয়া আদে[illegible]াক। [illegible], নিদর্শন।

দোকানে এটা রেখে চাল, ডাল, তেল, নুন নিয়ে এসো গে।” প্রসন্নচিত্তে চক্রবর্তী মশায় ঘড়া হাতে করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

চাল আসিল, ডাল আসিল, তেল আসিল, নুন আসিল, যথাসময়ে রন্ধনশালায় আমার ডাক পড়িল। আহারে বিন্দুমাত্র রুচি ছিল না, তথাপি নিঃশব্দে গেলাম। গিয়া দেখিলাম উনুন জ্বলিতেছে, এবং অন্নের পরিবর্তে কলাপাতায় চাল, ডাল, আলু ও একটা পিতলের হাঁড়ি। চক্রবর্তী উৎসাহভরে কহিলেন, ‘দিন হাঁড়িটা চড়িয়ে, চট্‌পট হ’য়ে যাবে। খাঁড়ি মুসুরের খিচুড়ি, আলু ভাতে, তোফা লাগ্‌বে খেতে। ঘি আছে, গরম গরম—”

কিন্তু পাছে আমার কোন কথায় বা কাজে আবার একটা প্রলয় কাণ্ড বাধিয়া যায়, এই ভয়ে তাঁহার নির্দেশমত হাঁড়ি চড়াইয়া দিলাম। চক্রবর্তী-গৃহিনী আড়ালে ছিলেন, স্ত্রীলোকের চক্ষে আমার অপটু হস্ত গোপন রহিল না। তিনি কহিলেন, “তুমি ত’, বাছা, রান্নার কিছুই জান না।” আমি তৎক্ষণাৎ মানিয়া লইয়া বলিলাম, “আজ্ঞে না। সুতরাং নির্দেশমত খিচুড়ি রাঁধিলাম এবং পিণ্ড পাকাইয়া গরম ঘি দিয়া তোফা গিলিবার চেষ্টাও করিলাম! কিন্তু কেবলই মনে হইতে লাগিল, চাল-ডালের তোফা পিণ্ড পেটের মধ্যে গিয়া পাথরে পিণ্ড পাকাইতেছে। হাত-মুখ ধুইবারও অবসর মিলিল না। সমস্ত বমি হইয়া গেল। ভয়ে শীর্ণ হইয়া উঠিলাম, কারণ এগুলো যে আমাকেই পরিষ্কার করিতে হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

কিন্তু সে শক্তি আমার ছিল না। চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হইয়া উঠিল। কোনমতে বলিয়া ফেলিলাম, “কোথাও আমাকে একটু শোবার জায়গা দিন, মিনিট পাঁচেক সামলে নিয়ে আমি সমস্ত পরিষ্কার ক’রে দেব।” কিন্তু আশ্চর্য এই! চক্রবর্তী-গৃহিণীর কণ্ঠস্বর অকস্মাৎ

কোমল হইয়া উঠিল। এতক্ষণে তিনি আমার সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, "তুমি কেন, বাবা, পরিষ্কার করতে যাবে, আমিই সব সাফ ক'রে ফেলছি। বাইরের বিছানাটা এখনও ক'রে উঠতে পারিনি, ততক্ষণ এসো তুমি আমার ঘরে গিয়ে শোবে।"

"না" বলিবার শক্তি নাই। নীরবে অনুসরণ করিয়া তাঁহারই শতচ্ছিন্ন শয্যায় আসিয়া চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িলাম। অনেক বেলায় ঘুম ভাঙ্গিল; তখন মাথা তুলিবারও শক্তি ছিল না, এমনই জ্বর।

আজ চক্রবর্তী-গৃহিণীর সহিত মুখোমুখি আলাপ হইল। আমার শয্যাপার্শ্বে আসিয়া বলিলেন, "ঘুম ভেঙ্গেছে, বাবা?"

চাহিয়া দেখিলাম। রুক্ষতার কোথাও কিছুই নাই; বলিলেন, "কাল আঁধারে দেখতে পাইনি বাবা, কিন্তু আমার বড় ছেলে বেঁচে থাকলে তার তোমার বয়সই হোত।"

তিনি হঠাৎ কপালে হাত ঠেকাইয়া বলিলেন, "জ্বরটা এখনও খুব রয়েছে।" আমি চোখ বুজিয়া ছিলাম, চোখ বুজিয়াই কহিলাম, "কেউ একটু সাহায্য করলে বোধ হয় হাসপাতালে যেতে পারবো,—সে ত' আর বেশী দূর নয়।"

আমার কথায় তাঁহার কণ্ঠস্বর যেন বেদনায় ভরিয়া গেল। বলিলেন, 'দুঃখের জ্বালায় কি একটা বলেছি বাবা, রাগ ক'রে ওই যমপুরীতে চলে যাবে? আর যাবে বললেই আমি যেতে দেব?'

অতএব রহিয়া গেলাম। বোধহয় সর্বসমেত দিন চারেক ছিলাম। তথাপি সেই চারিদিনের স্মৃতি সহজে ভুলিবার নয়। জ্বর একদিনেই গেল, কিন্তু বাকী দিন কয়টা দুর্বল বলিয়া তাঁহারা নড়িতে দিলেন না। কি ভয়ানক দারিদ্রের মধ্য দিয়াই এই ব্রাহ্মণ-পরিবারের দিন

কাটিতেছে! চক্রবর্তী-গৃহিণী তাঁহার অবিশ্রান্ত খাটুনির মধ্যে এতটুকু অবসর পাইলেই আমার কাছে আসিয়া বসিতেন। মাথায়, কপালে হাত বুলাইয়া দিতেন। ঘটা করিয়া রোগের পথ্য যোগাইতে পারিতেন না বটে, কিন্তু এই ক্রটি যত্ন দিয়া পূর্ণ করিয়া দিবার কি ঐকান্তিক চেষ্টাই না তাঁহার দেখিতে পাইতাম! তাঁহাদের দুইটি মাত্র শোবার ঘর, একটিতে ছেলেমেয়েরা থাকে এবং অন্যটি সম্পূর্ণ অপরিচিত ও বাহিরের লোক হইয়াও আমি অধিকার করিয়া আছি। ইহাতে আমার সঙ্কোচের অবধি ছিল না। বলিলাম, "যদি বাইরের ঘরে একটা বিছানা ক'রে দেন ত' আমি ভারি তৃপ্তি পাই।"

গৃহিণী ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, "সে কি হয়, বাছা! আকাশে মেঘ ক'রে আছে, বৃষ্টি যদি হয় ত' ওঘরে এমন ঠাঁই নেই যে মাথাটুকু রাখা যায়। তুমি রোগা মানুষ, এ ভরসা ত' করতে পারি না, বাবা!"

দিন তিনেক পরে সুস্থ হইয়া একদিন সকালে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বলিলাম, "মা, আজ আমাকে বিদায় দিন।" চক্রবর্তী-গৃহিণীর দুই চক্ষু জলে ভরিয়া গেল; বলিলেন, "দুঃখীর ঘরে অনেক দুঃখ পেলে বাবা।"

এ কথার উত্তর খুঁজিয়া পাইলাম না। মামুলি ভদ্রবাক্য উচ্চারণ করিতেও আমার লজ্জা বোধ হইল। আমার এক বন্ধুর কথা মনে পড়িল। সে একদিন বলিয়াছিল, "ঘর ছাড়িয়া আসিলে কি হইবে? এই বাংলাদেশের গৃহে গৃহে মা, বোন; সাধ্য কি তাঁদের স্নেহের আকর্ষণ এড়াইয়া যাই। কথাটা কত বড়ই না সত্য।

[সংক্ষেপিত]

অনুশীলনী

১। 'আমার পথ প্রদর্শক ডাক দিয়া কহিল'—কাহার পথ প্রদর্শক কাহাকে ডাক দিল এবং কেন ডাক দিল ?

২। 'সে ডাকের উপর ডাক দিতে লাগিল।'—কে কাহাকে ডাক দিল ? সে ডাকের কি জবাব আসিল ?

৩। 'কে এসেছে বা'র হ'য়ে দেখুন না।'—কে কাহার নিকট আসিয়াছে ?

৪। চক্রবর্তী আমাকে পরম সমাদরে গ্রহণ করিলেন।'—চক্রবর্তী কে ? তিনি কাহাকে পরম সমাদরে গ্রহণ করিলেন ?

৫। 'হাঁ গা, কে মানুষটি এলো ?'—প্রশ্নটি কাহার ? মানুষটি কে ?

৬। 'তিনি তাড়াতাড়ি বলিলেন, 'মস্ত লোক, সে মস্ত লোক।' তিনি কে ? মস্ত লোকটি কে ? লোকটির বিবরণ দাও।

৭। 'অতিথি নারায়ণ! বিমুখ হয়ে গেলে গলায় দড়ি দেব।'—কথাটি কাহার ? কে অতিথি ? তাহার নাম কি ?

৮। প্রসন্নচিত্তে চক্রবর্তী মশায় ঘড়া হাতে করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।' —চক্রবর্তী মশায় কে ? তিনি প্রসন্নচিত্ত কেন ? ঘড়া লইয়া বাহির হইবার কারণ কি ?

৯। 'তুমি ত' বাছা রান্নার কিছুই জান না।'—এখানে বক্তা কে ? 'তুমি কে ?' শেষ পর্যন্ত রান্না কিভাবে হইল ?

১০। 'সেই চার দিনের স্মৃতি সহজে ভুলিবার নয়।' —এখানে কোন্ চারিদিনের কথা বলা হইয়াছে ? কে ভুলিয়া যাইবে না ?

১১। 'আমার এক বন্ধুর কথা মনে পড়িল।'—কাহার মনে পড়িল ? কথাটি কি বল।

১২। শব্দগুলির অর্থ বল ও বাক্য গঠন কর :—
বিলম্ব, অপরাজেয়, অধ্যবসায়, নেপথ্যে, পুনশ্চ, বস্তুত, হৃৎকম্প, ব্যাকুল, নিঃশব্দ, অপটু, অকস্মাৎ, সঙ্কোচ, ঐকান্তিক।

১৩। শব্দগুলির বিপরীত অর্থ বল :—
অন্ধকার, আশ্রয়, উপস্থিত, শ্রী, বিচলিত, মলিন, উৎসাহ, শীর্ণ, কোমল, দুঃখ, দুর্বল, আকর্ষণ।

১৪। সন্ধি বিচ্ছেদ কর :—
প্রত্যুত্তর, অতিশয়োক্তি।



—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শিষ্যরা যেখানে সিদ্ধার্থকে একা ফেলে গেছে—উরাউল বনের সেদিকটা ভারি নির্জন। ঘন ঘন শালবন যেখানটা দিনরাত্রি ছায়া করে রেখেছে। মানুষ সেদিকে বড় একটা আসে না, দু-একটা হরিণ আর দু-দশটা কাঠবিড়ালি শুক্‌নো শালপাতা মাড়িয়ে খুসখুস শব্দে চলে বেড়ায় মাত্র।

এই নিঃসাড়া নিরালা বনটির গা দিয়ে গাঁয়ে যাবার ছোট রাস্তাটি অঞ্জনার ধারে এসে পড়েছে। নদীর ধারেই একটি প্রকাণ্ড বটগাছ—সে যে কতকালের তার ঠিক নাই। তার মোটা-মোটা শিকড়-গুলো উঁচু পাড় বেয়ে অজগর সাপের মতো সটান জলের উপর ঝুলে

পড়েছে। গাছের গোড়াটি কালো পাথর দিয়ে চমৎকার করে বাঁধানো। লোকে দেবতার স্থান বলে সেই গাছকে পূজা দেয়।

মোড়লের মেয়ে সুজাতা বিয়ের পরে একদিন ওই বটগাছের তলায় পূজো দিতে গিয়ে পুন্নাকে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। সেই থেকে সে মোড়লের ঘরে আর একটি মেয়ের সমান মানুষ হয়েছে। এখন তার বয়স দশ বছর। সুজাতার ছেলে হয়নি, তাই তিনি পুন্নাকে মেয়ের মতন যত্ন করে মানুষ করেছেন। আর মানত করেছেন যদি ছেলে হয় তবে এক-বছর বটতলায় রোজ একটি ঘিয়ের পিদিম দিয়ে নূতন বছরের পূর্ণিমায় ভাল করে বটেশ্বরকে পূজো দেবেন।

সুজাতার ঠাকুর সুজাতাকে একটি সোনার চাঁদ ছেলে দিয়েছিলেন, তাই পুন্না রোজ সন্ধ্যাবেলা একটি ঘিয়ের পিদিম দিতে এই বটতলায় আসে। আজ এক বছর সে আসছে, কোন দেবতাকে কিন্তু স্পষ্ট দেখতে পায়নি। আজ বছরের শেষ; কাল নূতন বছরে পূর্ণিমা। পুন্না আজ সকাল করে পাঁচটি পিদিম, পাঁচটি ফল থালায় সাজিয়ে একটি নিজের নামে, একটি ভায়ের নামে, একটি মায়ের নামে, একটি বাপের নামে, একটি মোড়লদাদার নামে সেই বটগাছের তলায় সাজিয়ে রাখছে। বিকেল-বেলার সোনার আলো বটগাছটির তলাটিতে এসে লেগেছে। রোদে-পোড়া বালির চড়ায় জলের দাগ টেনে বহে চলেছে অঞ্জনা নদীটি। ওপারে দেখা যাচ্ছে অনেকদূর পর্যন্ত ধানের ক্ষেত, আর মাঝে-মাঝে আম-কাঁঠালের বাগান-ঘেরা ছোট ছোট গ্রামগুলি। মাটির ঘর, খড়ের চাল, একটা পাহাড়—সে কত দূরে দেখা যাচ্ছে মেঘের মতো। নদীর ওপারেই মেঠো রাস্তা—সবুজ শাড়ীর সাদা পাড়ের মতো সরু, সোজা। সেই রাস্তায় চাষার মেয়েরা চলেছে ঘাসের বোঝা মাথায় নিয়ে। তাদের পরনে রাঙা শাড়ী, হাতে রূপোর

চুড়ি, পিঠের উপর ঝুলি-বাঁধা কচি ছেলেটি ঘুমিয়ে আছে হাত-দুটি মুঠো করে।

পুন্না দেখছে, বেলা পড়ে এসেছে। বালির উপর দিয়ে চলে আসছে অনেকগুলো কালো মোষ—একটার পিঠে মস্ত একগাছা লাঠি হাতে বসে রয়েছে গোয়ালাদের ছেলেটা। সে রোজ সন্ধ্যাবেলা মোষের পিঠে চড়িয়ে পুন্নাকে মোড়লদের বাড়ি পৌঁছে দেয়। আজও তাই আসছে। অনেক দূর থেকে সে ডাক দিচ্ছে 'আরে রে পুন্না-রে'! ছেলেটার নাম সোয়াস্তি। পুন্না তার গলা পেয়েই তাড়াতাড়ি পিদিম পাঁচটা জ্বালিয়ে দিয়েই যেদিক দিয়ে সোয়াস্তি আসছিল সেই দিকে চলে গেল।

তখন একখানি সোনার থালার মতো পূর্বদিকে চতুর্দশীর চাঁদ উঠেছে। পুন্না আর সোয়াস্তি মোষের পিঠে চড়ে বালির চড়া দিয়ে চলেছে। উঁচু পাড়ের উপর বটতলাতে ঝিকঝিক করছে পুন্নার দেওয়া পিদিমের আলো! সেই আলোয় সোয়াস্তি, পুন্না—দু'জনেই আজ স্পষ্ট দেখলে গেরুয়া-বসনপরা দেবতা এসে গাছের তলায় বসেছেন—পাথরের বেদীটিতে।

পুন্নাকে তাদের বাড়ীর দরজায় নামিয়ে দিয়ে সোয়াস্তি চলে গেল। সুজাতা তখন গরু-বাছুর গোয়ালে বেঁধে ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে সকালের জন্য পূজোর বাসন গুছিয়ে রাখছেন। পুন্না এসে বললে—'মা, আজ সত্যি দেবতাকে দেখেছি। কাল খুব ভোরে উঠে যদি তুমি সেখানে যেতে পারো তো তুমিও দেখতে পাবে। সোয়াস্তি আমি দুজনেই দেখেছি কিন্তু ঠাকুরের কাছে কিছু চেয়ে নিতে ভুলে গেলুম মা।'

সুজাতা বললেন—'যদি মনে পড়ত তবে কী চাইতিস পুন্না? সোয়াস্তির সঙ্গে তোর বিয়ে হোক—এই বুঝি।' পুন্না তখন

পালিয়েছে। সুজাতার পূজোর সমস্ত গুছিয়ে রেখে যখন ঘরে গেলেন, পুন্না তখন ছোট ভাইটির পাশে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

সুজাতার চোখে আজ ঘুম নেই। রাত থাকতে তিনি পুন্নাকে ডেকে তুলেছেন। পুন্না গোয়ালের দরজা খুলে এককোণে এক পিদিম জ্বালিয়ে গরুগুলিকে দুইতে বসেছে। ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় গরুগুলির শীত লেগেছে, তারা একটু ভয় খেয়েছে চঞ্চল হয়ে এদিক ওদিক চেয়ে দেখছে—এতরাত্রে কে দুধ নিতে এল? কিন্তু পুন্না যেমন তাদের পিঠে বাঁ হাতটি বুলিয়ে নাম ধরে ডাকছে অমনি তারা স্থির।

সুজাতা উঠোনের এককোণে একটি উনুন জ্বালিয়ে দিয়ে কূয়োর জলে স্নান করতে গেলেন। পুন্না দুধটুকু দুয়ে একটি ধোয়া কড়ায় যেই উনুনের উপর চাপিয়ে দিলে দুধ টগ্ বগ্ করে ফুটতে লাগল। সুজাতা ধোয়া কাপড় পরে পুন্নাকে এসে বললেন—'তুই গোটাকতক ফুল তুলে আন, আমি দুধ জ্বাল দিচ্ছি।'

মোড়লদের বাড়ির ধারেই বাগান; সেখানে গাঁদা ফুল অনেক। পুন্না সেই ফুলে একটা মালা গেঁথে বটের পাতয় একটু তেল সিন্দুর পূজোর থালায় সাজিয়ে রেখে সুজাতাকে ডাকছে—'মা' চল আর দেরী করলে সকাল হয়ে যাবে; দেবতাকে দেখতে পাবে না।'

সুজাতা জ্বাল-দেওয়া টাট্‌কা দুধটুকু একটি নূতন ভাঁড়ে ঢেলে পুন্নার হাতে দিয়ে বললেন—'তুই এইটে নিয়ে চল, আমি পূজোর থালা আর মন্নুয়াকে সঙ্গে নিয়ে যাই।' সুজাতার ছেলের নাম মন্নুয়া।

ভোরের অন্ধকারে গাঁয়ের পথ একটু একটু দেখা যাচ্ছে। পুন্না চলেছে আগে আগে দুধের ভাঁড় নিয়ে ঝুমুর-ঝুমুর মল বাজিয়ে, সুজাতা চলেছেন পিছনে পিছনে ছেলে-কোলে পূজোর থালাটি ডান হাতে নিয়ে। পুন্নার সঙ্গে একলা যেতে সুজাতার একটু একটু ভয় করছিল।

সোয়াস্তিদের বাড়ির কাছে এসে সুজাতা বললেন,—'ওরে সোয়াস্তিকে ডেকে নে না।' সোয়াস্তিকে আর ডাকতে হল না, সে পুন্নার পায়ের শব্দ পেয়েই একটা লাঠি আর একটা আলো নিয়ে বেরিয়ে এল।

তিনজনে মাঠ ভেঙ্গে চলেছেন। তখনো আকাশে তারা দেখা যাচ্ছে—রাত পোহাতে অনেক দেরী, কিন্তু এরি মধ্যে সকালের বাতাস পেয়ে গাঁয়ের উপর থেকে সারা রাতের জমা ঘুঁটের ধোঁয়া সাদা একখানি চাঁদোয়ার মতো ক্রমে ক্রমে আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে। উলুবনের ভিতর দু'একটা তিতির বকুল গাছে দু-একটা শালিক এরি মধ্যে একটু-একটু ডাকতে লেগেছে। একটি ফটিং-পাখি শিস দিতে দিতে মাঠের ওপারে চলে গেল। ছাতারেগুলো কিচমিচ, ঝুপ-ঝুপ করে কাঁঠালগাছের তলায় নেমে পড়ল। আলো নিবিয়ে সুজাতা আর পুন্নাকে নিয়ে সোয়াস্তি নদীর ধারে এসে দাঁড়াল। তখন দূরের গাছপালা একটু একটু স্পষ্ট হয়ে উঠেছে; নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে সুজাতা দেখছেন—বটগাছের নীচে যিনি বসে রয়েছেন তাঁর গেরুয়া কাপড়ের আভা বনের মাথার আধখানা আকাশ আলো করে দিয়েছে সকালের রঙে।

সুজাতা, পুন্না মনের মতো করে পূজো করে সিদ্ধার্থের আশীর্বাদ নিয়ে চলে গেছে। সোয়াস্তি তাঁকে কিছু দিতে পারে নি; তাই সে সারাদিন নদীর ধারে একলা বসে অনেক যত্নে কুশিঘাসের একটি আসন বুনে নদীর জলে সেখানি ঠাণ্ডা করে সিদ্ধার্থকে দেবার জন্য এসেছে। সিদ্ধার্থ তখনো বটতলাতে আসেন নি। সোয়াস্তি কুশাসনখানি বেদীর উপর বিছিয়ে দিয়ে মনে-মনে সিদ্ধার্থকে প্রণাম করে নদীপারে চলে গেল।

তখন সন্ধ্যা হয়-হয়, সিদ্ধার্থ অঞ্জনায় স্নান করে সোয়াস্তির দেওয়া

কুশাসনে এসে বসলেন। জলে-ধোয়া কুশ-ঘাসের মিষ্টি গন্ধে তাঁর মন যেন আজ আরাম পেয়েছে। পূর্ণিমার আলোয় পৃথিবীর শেষ পর্যন্ত আজ যেন তিনি দেখতে পাচ্ছেন—স্পষ্ট, পরিষ্কার।

অনুশীলনী

১। 'পুন্না রোজ সন্ধ্যাবেলা একটি ঘিয়ের পিদিম দিতে এই বটতলায় আসে।'—পুন্না কে? প্রতিদিন কেন সে 'পিদিম' দিতে আসে?

২। 'পুন্নাকে তাদের বাড়ির দরজায় নামিয়ে দিয়ে সোয়াস্তি, চলে গেল।' —সোয়াস্তি কে? পুন্না ও সোয়াস্তি কোথায় গিয়েছিল? কোথা হইতে তাহারা ফিরিল।

৩। 'যদি মনে পড়ত তবে কী চাইতিস পুন্না?'—কথাটি কে বলিয়াছে? পুন্না কাহার নিকট কি চাহিত বল।

৪। সুজাতার চোখে আজ ঘুম নেই। রাত থাকতে তিনি পুন্নাকে ডেকে তুলেছেন।'—সুজাতার চোখে কেন ঘুম নাই? তিনি কেন পুন্নাকে ডাকিলেন? তাহার পর এই দুই জনে কি করিল বল।

৫। সিদ্ধার্থকে কে প্রথম কোথায় দেখিতে পায়? কে কাহাকে এই সংবাদ দেয়?

৬। শব্দগুলির অর্থ বল ও বাক্য গঠন কর :—
নির্জন, নিরালা, চঞ্চল, স্পষ্ট।

৭। কোন্ বানানটি শুদ্ধ বল :—
অঞ্জনা/অঞ্চনা, মানত/মাণত, সুযাতা/সুজাতা, আশির্বাদ/আশীর্বাদ, পরিস্কার/পরিষ্কার।

৮। কোন্‌টি চলতি ও কোন্‌টি সাধু শব্দ বল :—
গাঁ, মানত, পিদিম, বসন, স্নান, ভাঁড়।

৯। সাধু ভাষায় বল :—
'বিকেল-বেলায়······হাত দুটি মুঠো করে।'—এই অংশটি 'বাণী বিতান' হইতে দেখিয়া বল।

লেখক কলম দিয়ে তুলির কাজ করেছেন এখানে। চোখের সামনে ... ফুটিয়ে তুলেছেন।

চৈতন্যদেব

—দীনেশচন্দ্র সেন

১৪০৭ শকে ১২ই ফাল্গুন রাত্রিতে চন্দ্রগ্রহণের সময় শ্রীচৈতন্যের জন্ম হয়। বাঙ্গালা দেশে কোটি লোক জন্মিতেছে, মরিতেছে, কিন্তু এই ব্রাহ্মণ বালকের মত এ পর্যন্ত একটি ছেলেও এ দেশ জন্মে নাই। চৈতন্যদেব তাঁহার প্রকৃত নাম নয়। তাঁহার প্রকৃত নাম বিশ্বম্ভর। ইহার পিতৃকুলের উপাধি ছিল মিশ্র। জগন্নাথ মিশ্রের পিতামহ মধুকর মিশ্র উড়িষ্যার রাজার অত্যাচারে যাজপুর হইতে একেবারে দীর্ঘপ্রস্থান করিয়া শ্রীহট্টের অন্তর্গত ঢাকা দক্ষিণ নামক গ্রামে আসিয়া বাস করেন। মধুকর মিশ্রের পুত্রদ্বয়ের নাম উপেন্দ্র ও জগন্নাথ মিশ্র। এই জগন্নাথ মিশ্রই চৈতন্যদেবের পিতা।

চৈতন্যদেবের একটি বড় ভাই ছিল। তাঁহার নাম বিশ্বরূপ, এইরূপ শোনা যায় যে—তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শঙ্করাণ্যপুরী উপাধি লইয়া তপস্যার জন্য বনবাসী হইয়াছিলেন।

বিশ্বরূপের অন্তর্ধানের পর জগন্নাথ মিশ্র পঞ্চ বৎসরের শিশু বিশ্বম্ভরের পড়াশুনা বন্ধ করিয়া দিলেন, পাছে লেখাপড়া শিখিয়া এই পুত্রটিও ঘরবাড়ি ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইয়া যায়। কিন্তু লেখাপড়া

ছাড়িয়া পাঁচ বৎসরের শিশু একটি দস্যুতে পরিণত হইল। কাহারো কলাবাগানের পাকা কলা চুরি করা, গঙ্গাস্নান করিতে যে সমস্ত ব্রাহ্মণ যাইতেন, তাহাদের চাদর ও কাপড় জলে ভিজাইয়া রাখা—ইত্যাদি-রূপ তৎকৃৎ নানা অত্যাচার পাড়া-পড়শীদের অসহ্য হইয়া উঠিল। প্রতিবেশীদের অনুরোধে-উপরোধে বাধ্য হইয়া জগন্নাথ মিশ্র পুত্রকে টোলে পাঠাইলেন। বিষ্ণুদাস, সুদর্শন ও গঙ্গাদাস—এই তিন পণ্ডিতের টোলে নিমাই পাঠ করেন ও অতি অল্প বয়সে সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত বলিয়া নবদ্বীপের সুধীসমাজে পরিচিত হন। বাসুদেব দত্ত নামক এক অর্থশালী ব্যক্তির বাটীতে সতের বৎসর বয়সে তিনি টোল স্থাপন করেন। এই টোলে তিনি ব্যাকরণের একখানি 'টিপ্পনী' প্রস্তুত করেন। এই টিপ্পনীখানির নাম 'বিদ্যাসাগর টিপ্পনী'। ইহা সেই সময়ে বঙ্গদেশের সমস্ত টোলের ছাত্রেরা পড়িত। পাঠশেষে বিশ্বম্ভরের উপাধি হইয়াছিল—'বিদ্যাসাগর'। তিনি আর একটি উপাধিও পাইয়াছিলেন। কেশব কাশ্মীর নামক এক অদ্বিতীয় পণ্ডিত নবদ্বীপে আগমন পূর্বক তথাকার পণ্ডিত মণ্ডলীকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করেন। চৈতন্যদেব তর্কযুদ্ধে বড় বড় পণ্ডিতদিগকে হারাইয়া দিতেন; সুতরাং বুড়া অধ্যাপকেরা কেশব কাশ্মীরীকে ইহারই নিকট পাঠাইয়া দিলেন। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত অজাতশশ্রু বালকের নিকট পরাভূত হইয়া পলায়ন করিলেন। নবদ্বীপের সমস্ত পণ্ডিত সেইদিনে একত্র হইয়া চৈতন্যদেবের উপাধি দিলেন—'বাদীসিংহ'।

এই সময়ে চৈতন্যদেবের পিতার মৃত্যু হয়। তিনি মাতার নিকট বিদায় লইয়া পিতৃপিণ্ড প্রদান করিবার জন্য গয়ায় গমন করিলেন। পথে ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে মিলন হইল। ঈশ্বরপুরীকে দেখিয়া তাঁহার চক্ষু হইতে ঘন ঘন অশ্রু পড়িতে লাগিল।

ইহার পর গয়ায় বিষ্ণুপাদপদ্মদর্শন। সে এক অপূর্ব কথা। চারিদিক হইতে শত শত পুষ্পমাল্য পাদপদ্মের উপর পড়িতেছে। কত পট্টবস্ত্র, কত অলঙ্কার যাত্রীরা সেই পাদপদ্মে নিবেদন করিতেছে। পাণ্ডারা দেখিল, এক দেবতুল্য আকৃতি পরম-সুদর্শন যুবক কাঁদিতে কাঁদিতে সেই পাদপদ্মের উপর অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছেন। তদবস্থায় সঙ্গীরা তাঁহাকে ধরিয়া বাসাবাড়িতে লইয়া আসিল। চৈতন্য হওয়ার পরে তিনি বলিলেন, 'তোমরা ফিরিয়া যাও, আমি আমার প্রাণনাথকে দেখিয়াছি। আমি বৃন্দাবন চলিলাম। আমি আর ঘরে ফিরিব না।'

......সকলেই যখন ঠিক করিল যে, চৈতন্যদেব পাগল হইয়াছেন, তখন শচীদেবী শ্রীবাসকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ইনি প্রবীণ ও নবদ্বীপের মধ্যে অতি বিশিষ্ট ব্যক্তি। চৈতন্য ঘরের কোণে বসিয়া কাঁদিতেছিলেন। শ্রীবাস ঘরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। দুই ঘণ্টা পরে তিনি বাহির হইলে শচীদেবী দেখিলেন—বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের চক্ষু জলে টলমল করিতেছে। শ্রীবাস শচীদেবীকে বলিলেন, 'কাহাকে তোমরা পাগল বলিয়াছ? আজ যাঁহাকে দেখিলাম, সে-রূপ জগতে আর কেহ দেখে নাই।'

কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রীবাস চলিয়া গেলেন। তারপর হইতে শ্রীবাসের প্রশস্ত আঙ্গিনায় রোজ রোজ সায়াহ্নে খোল বাজিয়া উঠিত। যেদিন কাজী নদীয়ার চাঁদকে কীর্তন করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন, সেদিন চৈতন্য শত শত, সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ লোক লইয়া কীর্তন করিতে বাহির হইলেন। সেকি অপূর্ব অভিযান! নদীয়া সেদিন বৈকুণ্ঠ। লক্ষ লক্ষ হস্তে মশাল, শত শত মৃদঙ্গ, সহস্র সহস্র করতাল!

কিন্তু চৈতন্যকেও সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হইল। নবদ্বীপের ভট্টাচার্য পণ্ডিতেরা দর্শন শাস্ত্রের তর্কযুক্তি লইয়া বিচার করিয়া

বলিলেন, 'কোন শাস্ত্রে এরকম লেখে না যে, জয়ঢাক বাজাইয়া রাস্তায় রাস্তায় ভগবানের নাম লইতে হইবে।' চৈতন্য ভাবিলেন, 'গৃহীর মুখে ইহারা হরিনাম শুনিবে না। আমি সন্ন্যাসী হইব এবং দুয়ারে দুয়ারে তাঁহার নাম গাহিব।,' চৈতন্য মাতার নিকট অনুমতি চাহিলেন। মাতা যখন অনুমতি দিতে কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না, তখন চৈতন্যদেব বলিলেন—'মা, তুমি সেই দেশের মেয়ে—যেখানে কৌশল্যা রামকে বনবাসের আজ্ঞা দিয়েছিলেন। এদেশ ধর্মশীলা ত্যাগশীলা নারীর দেশ। তুমি পুত্রস্নেহের নিগড়ে আবদ্ধ হইয়া প্রকৃত সত্যদৃষ্টি ভুলিয়া যাইবে? শচীদেবী অতীব ধর্মশীলা ছিলেন। তিনি, প্রাণপ্রিয় পুত্রকে বিদায় দিলেন।

সন্ন্যাসের পর চৈতন্যদেব যে সকল অদ্ভুত লীলা করিয়াছিলেন, সমস্ত ভারতবর্ষ পর্যটন করিয়া দ্রাবিড়, তৈলঙ্গ, তামিল, কর্ণাট, বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশে ঘরে ঘরে যেভাবে নাম বিতরণ করিয়াছিলেন, সে ইতিহাস স্বর্ণাক্ষরে লিখিত। ১৪৫৫ শকে শুক্লপক্ষীয় আষাঢ় মাসের সপ্তমী তিথিতে রবিবার দিন পুরীধামে তাঁহার অপূর্ব লীলার শেষ হয়। তিনি কিঞ্চিদধিক ৪৮ বৎসর কাল জগতে লীলা করিয়াছিলেন। এই লীলার কথা জগৎ কোন কালেও বিস্মৃত হইবে না!

অনুশীলনী

১। 'এই ব্রাহ্মণ বালকের মত এপর্যন্ত একটি ছেলেও এদেশে জন্মেন নাই।'—এই ব্রাহ্মণ বালকটির নাম কি? তাঁহার পিতার নাম কি?

২। চৈতন্যদেবের প্রকৃত নাম কি? কি ভাবে তাঁহার শৈশবকাল কাটিয়াছিল বল।

৩। নিমাই যে তিন জন পণ্ডিতের টোলে পাঠ লইয়াছিলেন তাঁহাদের নাম কর। নিমাই কত বৎসর বয়সে কাহার বাড়ীতে টোল স্থাপন করেন?

৪। 'বিদ্যাসাগর টিপ্পনী' কাহার রচনা? 'বিদ্যাসাগর' উপাধি কে লাভ করেন?

৫। চৈতন্যদেব কি ভাবে 'বাদী সিংহ' উপাধি লাভ করেন?

৬। 'ইহার পর গয়ায় বিষ্ণুপাদপদ্ম দর্শন। সে এক অপূর্ব কথা।' কে বিষ্ণুপাদপদ্ম দর্শনে যান? সেই 'অপূর্ব কথা' বল।

৭। 'আমি আর ঘরে ফিরব না।'—কে বলেন? তিনি কেন ঘরে ফিরবেন না?

৮। 'আমি সন্ন্যাসী হইব এবং দুয়ারে দুয়ারে তাঁহার নাম গাহিব।'—কে সন্ন্যাসী হইবেন? তিনি দুয়ারে দুয়ারে কাহার নাম গাহিবেন?

৯। 'তিনি প্রাণপ্রিয় পুত্রকে বিদায় দিলেন।'—কে পুত্রকে কেন বিদায় দিলেন?

১০। এই চরিত্রগুলির সহিত চৈতন্যদেবের সম্পর্ক কি ছিল বল।—মধুকর মিশ্র, বিশ্বরূপ, সুদর্শন, বাসুদেব দত্ত, কেশব কাশ্মীরী, ঈশ্বরপুরী, শ্রীবাস।

১১। শূন্যস্থানগুলি উপযুক্ত ভাবে পূর্ণ কর:-
— শকে — ফাল্গুন রাত্রিতে চন্দ্রগ্রহণের সময় চৈতন্যের জন্ম হয়।

১২। শব্দগুলির অর্থ বল:—
মধুকর, উৎকৃৎ, সুধী, অদ্বিতীয়, দিগ্বীজয়ী, অজাতশত্রু, পট্টবস্ত্র, অলঙ্কার, প্রশান্ত, আঙ্গিনা, মৃদঙ্গ, নিগড়, পর্যটন।

অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ পুণ্যশ্লোক চৈতন্যদেবের জীবনকাহিনী এখানে বর্ণিত হয়েছে। দুরন্ত ছেলেটি কীভাবে বাদীসিংহ 'বিদ্যাসাগর টিপ্পনী'-র উদ্যোগ ছেড়ে প্রেম-চৈতন্য লাভ করলেন এবং কীভাবে দেশবাসীর মনে নোতুন ভাবের জোয়ার আনলেন তা অপূর্ব সুন্দর ভাষায় লেখক এখানে ফুটিয়ে তুলেছেন।



এভারেষ্ট বিজয়

—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

ভারবাহী শেরপাদের বাদ দিয়ে হিমালয়ের এই শেষ অধিযানে কর্ণেল হাণ্টের নায়কত্বে তেরজন নির্ধারিত পর্বতারোহী ছিলেন। এই তেরজনের মধ্যে একজন হ'লেন ভারতীয় তেনজিং, আর দু'জন হলেন নিউজিল্যাণ্ড বাসী, বাকী সকলেই ইংরেজ। তাঁদের সকলের নাম হল কর্ণেল হাণ্ট (নায়ক), মেজর উইলি, নইস, বুদিলোঁ, গ্রেগরী, ব্যানডে, ইভান্স, হিলারী লাওরি, ওয়েষ্টম্যাকট, ওয়ার্ড, পাফ্, স্টোবার্ট ও তেনজিং।

এভারেষ্ট অভিযানের যাত্রাকেন্দ্র হল, নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডু। এইখানেই নানা দিক থেকে অভিযাত্রীরা সকলে এসে মিলিত হন এবং এখান থেকেই কুলিদেরও সংগ্রহ করা হয়। আগেকার অধিকাংশ অভিযানের মত এই অভিযানও 'আলপাইন ক্লাব' আর ইংলণ্ডের জগৎ বিখ্যাত রয়েল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটির যুক্ত তত্ত্বাবধানে গঠিত হয়।

ইতিমধ্যেই তেনজিং-এর কাছে আমন্ত্রণ পৌছে গিয়েছিল। তেনজিংকে বাদ দিয়ে কোন এভারেষ্ট অভিযানই গঠিত হতে পারে

না। কিন্তু সুইস অভিযান থেকে ফিরে আসার সঙ্গে-সঙ্গেই তেনজিং অতি কঠিন ম্যালেরিয়া রোগে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। তাঁর শরীর রীতিমত দুর্বল হয়ে যায়। কিন্তু এভারেষ্টের আমন্ত্রণ পাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে তিনি দেহমন থেকে সমস্ত জড়তা ঝেড়ে ফেললেন। ঘরের শান্ত, স্নিগ্ধ, মমতাময় জীবনকে পেছনে ফেলে রেখে তিনি ছুটলেন মৃত্যু সঙ্কুল সেই ভয়ঙ্করের পথে।

ভয়ঙ্কর যাদের ডাক দেয়, কোন বন্ধনই আর তাদের ধরে রাখতে পারে না। তিনি কাঠমাণ্ডুতে এসে অভিযাত্রীদের সঙ্গে যোগদান করলেন, এবং প্রথমেই কর্ণেল হাণ্টকে জানালেন, তিনি এই অভিযানে যোগদান করবার জন্যেই এসেছেন, কিন্তু তাঁর একটা সর্ত আছে। সে সর্ত মেনে না নিলে তিনি এই অভিযানে যোগদান করবেন না। সে সর্ত হল, তাঁকে পুরোপুরি অভিযাত্রী বলে মেনে নিতে হবে এবং তিনি যদি সক্ষম হন, তা হ'লে তাঁকে একাই এভারেষ্টের চূড়ার দিকে অগ্রসর হবার অধিকার দিতে হবে।

কাঠমাণ্ডুর ব্রিটিশ এমব্যাসীতে এই নিয়ে সভা বসল এবং সভায় স্থির হ'ল তেনজিং-এর সর্ত স্বীকার করা হবে। তেনজিং আনন্দে অভিযানের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। চারদিক থেকে কুলীরা আসতে লাগল। তেনজিং তার ভেতর থেকে লোক বাছাই করতে লাগলেন।

সমস্ত আয়োজন শেষ হয়ে গেল, দু'দলে অভিযাত্রীদের ভাগ করা হ'ল। প্রথম দলে রইল ন'জন অভিযাত্রী, একশো বাষট্টিজন ভারবাহী আর আঠারোজন শেরপা। দ্বিতীয় দলে রইলেন স্বয়ং কর্ণেল হাণ্ট আর তিনজন অভিযাত্রী, দু'শো জন ভারবাহী, আর দু'জন শেরপা, সমস্ত মালের ওজন হ'ল সতেরোশো পাউণ্ড।

কাঠমাণ্ডু থেকে অভিযান যাত্রা করল নামচে বাজারের দিকে—কাঠামাণ্ডু থেকে একশ সত্তর মাইল দূর। এই নামচে বাজার থেকে প্রকৃতপক্ষে সুরু হয় আসল অভিযান। এই একশো সত্তর মাইল পথ এত দুরূহ আর দুর্গম যে, অভিজ্ঞ নেপালী শেরপারা ছাড়া এই পথ দিয়ে কেউ অগ্রসর হতে পারে না। অন্য পথ দিয়ে অবশ্য নামচে বাজারে পৌঁছানো যায়, কিন্তু তাতে সময় লাগে ঢের বেশী।

থায়াংবক থেকে সুরু হয়েছে এভারেষ্টের তুষারক্ষেত্র। একটা বিরাট গ্লেসিয়ারের প্রান্তেই থায়াংবক। এইখানে সমস্ত অভিযান তিন সপ্তাহ অপেক্ষা ক'রে রইল। কারণ এইখানে হিমালয়ের তুহিন প্রকৃতির সঙ্গে অভিযাত্রীর আর শেরপাদের নিজেদের অভ্যস্ত ক'রে তুলতে হয়। তাছাড়া এইখান থেকেই সুরু হয় পথ-ঘাট জরিপ ক'রে দেখা। নতুন কোন ভাল পথ খুঁজে পাওয়া যায় কিনা, সামনের পথের অবস্থা কি রকম, পরবর্তী তাঁবু কোন্ জায়গায় স্থাপন করা সম্ভব হবে, সব এইখান থেকেই নির্ধারিত হয়।

থায়াংবক মঠের বৌদ্ধ শ্রমণেরা অভিযাত্রীদের আশীর্বাদ করলেন। থায়াংবক মঠের সামনে থেকেই সুরু হয়েছে বিশাল খুম্বু গ্লেসিয়ার বা হিমবাহ। এই হিমবাহ পেরিয়ে অগ্রসর হ'তে হবে। এইখান থেকেই বাতাস খুব পাতলা হয়ে আসে। তাই এখানে কয়েকদিন বাস ক'রে এই পাতলা বাতাসকে সহ্য ক'রে নিতে হয়।

১৯৫৩ সালের আঠাশে মে, তেনজিং আর হিলারী সাত নম্বর তাঁবু থেকে যাত্রা করলেন। তাঁরা ঠিক করলেন, সোজা এভারেষ্টের চূড়ার দিকে অগ্রসর না হ'য়ে তাঁরা যত উঁচুতে পারেন, এমনভাবে আট নম্বর তাঁবু ফেলবেন, যাত্রা ক'রে রাত্রির বিশ্রামের পর পরের দিন সকালবেলা তাঁরা শেষ তিনশো কি সাড়ে তিনশো ফুট জয় ক'রে

ফিরে আসতে পারেন। এই উচ্চতায় তাঁদের সঙ্গে আর একজন তরুণ শেরপাও এসেছিল,—তার নাম আংগনিমা। তাঁদের ছু'জনকে সাহায্য করার জন্য গ্রেগরী, লাওয়ি আর আংগনিমাকে পাঠান হয়।

সাত নম্বর তাঁবু থেকে পথ প্রায় খাড়া সোজা ওপরের দিকে উঠে গিয়েছে, প্রত্যেক পদে নিজের হাতে বরফ কেটে ধাপ তৈরী ক'রে সেই খাড়া পথে উঠতে তাঁদের ছু'জনেরই মেরুদণ্ড যেন ভেঙে পড়তে লাগল। তার ওপর তাঁরা ভীত হয়ে দেখলেন, তাঁদের অক্সিজেন যন্ত্রের অক্সিজেন প্রয়োজনীয় মাত্রা থেকে অনেক কমে গিয়েছে। তখন বাধ্য হ'য়ে তাঁরা কম মাত্রায় অক্সিজেন নিতে লাগলেন।

কিন্তু সেই খাড়া পাহাড়ের গায়ে কোথাও একটা তাঁবু ফেলবার মতন সামান্য জায়গাও পাওয়া গেল না। গত বছর তেনজিং সুইস অভি-যাত্রীদের সঙ্গে এই পথেই এসেছিলেন, সেই সময় তিনি একটা জায়গা লক্ষ্য করেছিলেন। বহু খোঁজাখুঁজির পর তেনজিং সেই জায়গা বার করলেন এবং সাতাস হাজার আটশো ফুটে আট নম্বর তাঁবু ফেলা হ'ল।

উনত্রিশে ভোর ছ'টা বাজতেই তেনজিং আর হিলারী শেষ অভিযানের জন্যে সজ্জিত হ'য়ে বেরিয়ে পড়লেন। ন'টার সময় তাঁরা দক্ষিণ চূড়ায় এসে উঠলেন, সেখান থেকে এভারেষ্টের মূল চূড়া হ'ল আর আধমাইল মাত্র। সেখানে এসে মিনিট দশেক তাঁরা একটু বিশ্রাম ক'রে নিলেন। মুখ থেকে অক্সিজেন নেবার মুখোস খুলে ফেললেন। দেখলেন বিশেষ কোন অসুবিধা হচ্ছে না।

সেখান থেকে সেই আধমাইল পথ অতিক্রম করতে আড়াই ঘণ্টা লাগল। সাড়ে এগারটার সময় তেনজিং এভারেষ্টের চূড়ায় গিয়ে উঠলেন, তারপর হিলারীকে হাত বাড়িয়ে উপরে তুলে নিলেন। পঞ্চাশ বছর ধ'রে মানুষের অবিরাম অবিশ্রান্ত সাধনা সেদিন জয়যুক্ত হ'ল।

এভারেষ্টের চূড়ায় কে প্রথমে উঠেছিলেন, এই নিয়ে বহু বাদানুবাদ হয়। একথা নিঃসন্দেহ যে, তেনজিংই প্রথম এভারেষ্টর চূড়ায় পদার্পণ করেন।

চূড়ায় পদার্পণ করে তেনজিং নতজানু হয়ে ভগবান বুদ্ধকে স্মরণ করলেন—সঙ্গে যে চকোলেট আর বিস্কুট ছিল, তারই অর্ঘ্য মাটিতে রেখে ইষ্টদেবতাকে নিবেদন করলেন।

তারপর নেপাল আর ভারতের পতাকা সেখানে পুঁতলেন। ভারতের পতাকা তাঁকে কোন ভারতীয় নেতা বা ভারত রাষ্ট্রের প্রতিনিধি দেননি। তাঁর এক বাঙালী বন্ধু একটি ছোট ত্রিবর্ণ পতাকা তাঁর হাতে দেন। বন্ধুর দেওয়া সেই ছোট্ট পতাকাটুকু রাখল ভারত-রাষ্ট্রের সম্মান।

অনুশীলনী

১। হিমালয়ের শেষ অভিযানে কর্ণেল হাণ্টের নায়কত্বে যে তেরজন পর্বতারহী ছিলেন তাঁহাদের নাম কর। এই অভিযান কোন্ সংস্থার তত্ত্বাবোধনে গঠিত হয়?

২। শূন্যস্থানগুলি উপযুক্ত ভাবে পূর্ণ কর :—

(ক) কাঠমাণ্ডু থেকে অভিযান যাত্রা করল — দিকে।

(খ) — থেকে সুরু হয়েছে এভারেষ্টের —।

(গ) — সালের —, তেনজিং আর — — নীরবে তাঁবু থেকে যাত্রা করলেন।

(ঘ) — ভোর ছটা বাজতেই — আর — শেষ অভিযানের জন্য সজ্জিত হয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

৩। তেনজিং ও হিলারী কিভাবে সাত নম্বর তাঁবু হইতে এভারেষ্ট চূড়ায় পদার্পণ করেন? তাহার বিবরণ দাও।

৪। তেনজিং-হিলারী অভিযাত্রী দল নামচে বাজার হইতে যেখানে যেখানে গিয়েছিল, সেই জায়গাগুলির নাম কর।

৫। শব্দগুলির অর্থ বল :—

তত্ত্বাবোধানে, অভিযাত্রী. আত্মনিয়োগ, পদার্পণ, ইষ্টদেবতা, দুরূহ, দুর্জয়, দুর্গম, সঙ্কুল।

৬। পদ নির্ণয় কর :—

শেরপা, নেপাল, বিখ্যাত, দুর্বল, তিনি, তাঁবু, পতাকা, ত্রিবর্ণ।

রাজা রামমোহন

ডঃ মনোরঞ্জন জানা



বাংলা তথা ভারতবর্ষের নবজাগরণের পথিকৃৎ রামমোহনের জন্ম হয় ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী জেলার অন্তর্গত রাধানগর গ্রামে। তাঁর বাবার নাম ছিল রাধাকান্ত রায়। ইনি একজন বিচক্ষণ অবস্থাপন্ন ইজারাদার ছিলেন। শিক্ষায় সংস্কৃতিতে, রুচিতে তাঁর পরিবার সেকালে বেশ উন্নত ছিল। এই পরিবেশে রামমোহন অল্প বয়স হতেই বলিষ্ঠতা ও মনের প্রসারতা অর্জন করেন। অল্প বয়সেই তিনি আরবী, ফারসী ও সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন লাভ করেন। তারপর তাঁকে সস্কৃত শিক্ষা লাভের জন্য কাশী পাঠানো হয়। সেখানে তিনি পাঁচ বছর সংস্কৃত শিক্ষা লাভ করেন।

এই সময় হতেই তিনি হিন্দুর একেশ্বরবাদে আকৃষ্ট হন। সেই সঙ্গে তিনি হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে 'হিন্দুদিগের পৌত্তলিক ধর্ম প্রণালী' নামে এক পুস্তিকা প্রচার করেন। এই পুস্তিকা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সকলের বিরাগ ভাজন হয়ে পড়েন। ফলে তিনি গৃহত্যাগ করে ভারতের নানা স্থান ভ্রমণ করে বহু দুঃখ ও ক্লেশ স্বীকার করে পরিশেষে তিব্বতে চলে যান। সেখানে তিনি ছিলেন চার বছর। সেখানে দুষ্প্রাপ্য নানা হিন্দু ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে তাঁর একেশ্বরবাদ আরো দৃঢ় হয়।

তিব্বত থেকে ফিরে এসে তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে জজের সেরেস্তাদারীর কাজ গ্রহণ করেন। ইতিমধ্যে তাঁর পিতা পরলোক গমন করেছেন।

এই সময় তিনি যে সাহেবের কাছে কাজ করতেন, তাঁর নিকট ইংরেজী শিখতে শুরু করলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন দেশবাসী সকলের ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া উচিত। ইংরেজী শিক্ষা যাতে সমস্ত দেশে চালু হয়, তার জন্য তিনি সচেষ্ট হলেন। তাঁর চেষ্টায় সরকারের পক্ষে এত সহজে ইংরেজী শিক্ষা চালু করা সম্ভব হয়েছিল। এরপর নারী জাতির শিক্ষার প্রতি তাঁর দৃষ্টি যায়। তাঁরই প্রযত্নে বাংলা দেশের নারীরা প্রথম শিক্ষা লাভের সুযোগ পেয়েছিলেন।

হিন্দু সমাজে যে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল, তাতে হিন্দু নারী মাত্রকেই ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় মৃত স্বামীর চিতায় প্রাণত্যাগ করতে হত। এই কু-প্রথা রামমোহনকে গভীর ভাবে পীড়া দেয়। তিনি এই প্রথার বিরুদ্ধে জনমত গঠনের জন্য নানা পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখতে এবং নানা সভায় বক্তৃতা দিতে সুরু করলেন। কিন্তু তাতেও যখন কিছু হল না, তখন তিনি সরকারের সাহায্য প্রার্থনা করলেন। রামমোহনের বিরুদ্ধে নানা অপপ্রচার ও ষড়যন্ত্র চলতে থাকে। কিন্তু রামমোহনের অক্লান্ত চেষ্টায় ও অবিচলিত নিষ্ঠায় একদিন সতীদাহ প্রথা আইনত অবৈধ বলে স্বীকৃত হল।

এই সময় হিন্দুধর্মের নানা কুসংস্কার ও দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ইংরেজরা দলে দলে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করতে থাকেন। রামমোহন এই ব্যাপারে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে এর তীব্র নিন্দা করেন। এই সময় রামমোহন একদিকে বিদেশীদের বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করেন, অন্যদিকে হিন্দু সমাজকে নানা কুসংস্কার থেকে মুক্ত

করে একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হন। এই কাজে যাঁরা তাঁর সহায়তা করেছিলেন, তাঁদের নিয়ে তিনি ব্রাহ্ম-সমাজ নামে একটি সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। সেই ধর্মকে বলা হয় ব্রাহ্মধর্ম।

এরপর তিনি যখন ইংলণ্ডে যাবার অভিলাষ প্রকাশ করলেন তখন আত্মীয়-স্বজনরা তাঁকে বাধা দিলেন। তাঁকে একঘরে করবার ভয় দেখালেন, কিন্তু তিনি তাঁর সঙ্কল্পে অবিচলিত রইলেন।

রামমোহন ইংলণ্ডে বিপুলভাবে সম্বর্ধিত হন। তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে, তাঁর রচনাবলী পাঠ করে ইংলণ্ডের শিক্ষিত সমাজ হিন্দুধর্মের উদারতা সম্পের্কে প্রথম সচেতন হন।

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে তিনি ইংলণ্ডের ব্রিস্টল নগরে দেহত্যাগ করেন। ভারতের স্বাধীনতা লাভ এত দ্রুত সম্ভব হয়েছে, রামমোহনের মত এক বিরাট পুরুষের উদার মনোভাবের বিপুল পাণ্ডিত্যের সংস্পর্শে এসে। যে ইংরেজী শিক্ষার ফলে বর্তমান ভারতবাসী বিশ্বসভ্যতাকে তার একান্ত হৃদয়ের সামগ্রী করেছে, সে শিক্ষার দ্বার রামমোহনই প্রথম উদঘাটিত করেন। এর জন্য ভারতবাসী চিরকাল রাজা রামমোহনের কাছে ঋণী হয়ে থাকবে।

অনুশীলনী

১। রামমোহন কোন্ কোন্ ভাষা শিখিয়াছিলেন?

২। রামমোহন হিন্দু ধর্মের পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে যে পুস্তিকাটি প্রচার করেন, তাহার নাম কি?

৩। রামমোহনের ধর্ম, শিক্ষা ও সমাজ বিষয়ক সংস্কারগুলির নাম কর।

৪। শূন্যস্থানগুলি উপযুক্ত ভাবে পূর্ণ কর :—

(ক) নানা হিন্দুধর্ম গ্রন্থ পাঠ করে তাঁর — আরো দৃঢ় হয়।

(খ) তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে জজের — কাজ গ্রহণ করেন।

(গ) তাঁরই চেষ্টায় বাংলাদেশের — প্রথম শিক্ষা লাভের সুযোগ পেয়েছিলেন।

(ঘ) তাঁর রচনাবলী পাঠ করে ইংলণ্ডের শিক্ষিত সমাজ হিন্দুধর্মের — সম্পর্কে প্রথম সচেতন হন।

(ঙ) রামমোহনের জন্ম হয় — খ্রীষ্টাব্দে, আর — খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

৫। শব্দগুলির অর্থ বল :—

পথিকৃৎ, ব্যুৎপন্ন, পৌত্তলিকতা, দুষ্প্রাপ্য, নিষ্ঠা, ক্ষুব্ধ, উদ্ঘাটিত।

৬। বিপরীত শব্দগুলি বল :—

জাগরণ, উন্নত, বলিষ্ঠতা, ক্লেশ, অস্বীকার, পরলোক, সুরু, প্রচলিত, বিচলিত, অবৈধ, নিন্দা।

৭। লিঙ্গ পবিবর্তন কর :—

পিতা, নারী, স্বামী, বিদেশী, আত্মীয়।

৮। এই রচনাটি হইতে পাঁচটি করিয়া বিশেষ্য, সর্বনাম, বিশেষণ ও ক্রিয়া বাহির কর।

আধুনিক ভারতের জনক রাজা রামমোহন ছিলেন নবজাগরণের পুরোহিত, তিনিই পুঞ্জীভূত কুসংস্কার ও মানসিক জঞ্জালকে সরিয়ে দিয়ে কিভাবে নূতন ঊষাকে আবাহন করলেন নূতন ভারত গঠনের জন্য তা এখানে দেখানো হয়েছে।

প্রার্থনা

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিপদে মোরে রক্ষা করো
এ নহে মোর প্রার্থনা,
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।

দুঃখ-তাপে ব্যথিত চিতে
নাই বা দিলে সান্ত্বনা,
দুঃখ যেন করিতে পারি জয়!
সহায় মোর না যদি জুটে
নিজের বল না যেন টুটে,
সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি
লভিলে শুধু বঞ্চনা
নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয়।

আমারে তুমি করিবে ত্রাণ
এ নহে মোর প্রার্থনা,
তরিতে পারি শকতি যেন রয়।
আমার ভার লাঘব করি
নাই বা দিলে সান্ত্বনা'
বহিতে পারি এমনি যেন হয়।

নম্রশিরে সুখের দিনে
তোমারি মুখ লইব চিনে,
দুখের রাতে নিখিল ধরা
যেদিন করে বঞ্চনা
তোমারে যেন না করি সংশয় ॥

কবি আত্মনির্ভরশীল হবার, পুরুষকারে এগিয়ে চলবার শক্তি ও সাহস প্রার্থনা করেছেন, দেবতার কৃপা ও অনুগ্রহ অপেক্ষা আত্মশক্তিতে সমস্যার মুখোমুখি হবার ও জয়ী হবার বাসনা প্রকাশ করেছেন তিনি, কবিবাণী আধুনিক যুগের, আধুনিক মননের প্রতিফলন।

অনুশীলনী

১। (ক) 'বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা'—কবির কি প্রার্থনা বল।
(খ) 'আমারে তুমি করিবে ত্রাণ এ নহে মোর প্রার্থনা'—কবি কাহার নিকট কি প্রার্থনা করিতেছেন বল।

২। 'দুঃখে তাপে ব্যথিত চিতে' ও 'আমার ভার লাঘব করি—নাই বা দিলে সান্ত্বনা'—তবে সান্ত্বনার বদলে কবি কি চাহিতেছেন ?

৩। কবি 'সুখের দিনে' ও 'দুঃখের রাতে' কি করিবেন ?

৪। পদ নির্ণয় কর :—
মোর, তাপ, লাঘব, নিখিল।

৫। গদ্যরূপ লিখ :—
মোর, চিতে, শকতি, তোমার।

৬। বিপরীত শব্দ বল :—
বিপদ, ক্ষয়, নম্র, দিন, দুঃখ।

৭। কোন্ বানানটি শুদ্ধ বল :—
প্রার্থনা/প্রার্থণা, বেথিত/ব্যথিত, বঞ্চনা/বঞ্চণা, স্বান্তনা/সান্ত্বনা, সংশয়/সংসয়।

৮। অর্থ বল ও বাক্য গঠন কর :—
দুঃখ-তাপ, ত্রাণ, লাঘব, বঞ্চনা, নিখিল, সংশয়।

৯। কবিতাটি আবৃত্তি কর (একক ভাবে)।



স্বাধীনতা

—রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়

স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায়।
দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে,
কে পরিবে পায়॥

কোটী-কল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে,
নরকের প্রায়।
দিনেকের স্বাধীনতা, স্বর্গ-সুখ তায় হে,
স্বর্গ-সুখ তায়॥

ওই শুন! ওই শুন! ভেরীর আওয়াজ হে,
ভেরীর আওয়াজ।
সাজ সাজ সাজ বলে, সাজ সাজ সাজ হে,
সাজ সাজ সাজ॥

সার্থক জীবন আর বাহু-বল তার হে,
বাহু-বল তার।
আত্মনাশে যেই করে দেশের উদ্ধার হে,
দেশের উদ্ধার॥

অতএব রণভূমে চল ত্বরা যাই হে,
চল ত্বরা যাই।
দেশহিতে মরে যেই তুল্য তার নাই হে
তুল্য তার নাই ॥

কবি মুক্ত ও স্বাধীন জীবনের আনন্দের কথা এখানে বলেছেন। পরাধীনতা ক্রীতদাসত্বের নামান্তর। অতএব, দেশকে উদ্ধার করার জন্যে আত্মোৎসর্গ প্রত্যেকটি দেশপ্রেমিককে অমর করে। কবিতাটিতে দেশপ্রেমের বন্দনা করা হয়েছে।

অনুশীলনী

১। (ক) 'স্বাধীনতা-হীনতায়' কেহ বাঁচিতে চায় না কেন?
(খ) 'দাসত্ব-শৃঙ্খল' কেহ পরিতে চায় না কেন?

২। (ক) 'কোটি-কল্প দাস থাকা' কিসের 'প্রায়'?
(খ) 'দিনেকের স্বাধীনতা' কোন্ সুখের সমান?

৩। কবি কোন্ জীবনকে সার্থক বলিয়াছেন বল।

৪। (ক) 'ওই শুন!'—কিসের আওয়াজ?
(খ) 'চল ত্বরা যাই।'—কোথায়?
(গ) 'তুল্য তার নাই।'—কিসের?

৫। কবিতাটি আবৃত্তি কর (একক ভাবে/সমবেত ভাবে)।

৬। অর্থ বল ও বাক্য গঠন কর :—
স্বাধীনতা, শৃঙ্খল, সার্থক, বাহুবল, আত্মনাশ, উদ্ধার, ত্বরা, অতএব, দেশহিত।

৭। বিপরীত শব্দ বল :—
স্বাধীনতা, নরক, দাস, জীবন, হিত।

জীবন সঙ্গীত

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ব'লো না কাতর স্বরে বৃথা জন্ম এ সংসারে,
এ জীবন নিশার স্বপন,
দারা পুত্র পরিবার তুমি কার, কে তোমার—
ব'লে জীব ক'রো না ক্রন্দন।
মানব জনম সার, এমন পাবে না আর।
বাহ্যদৃশ্যে ভুলোনারে মন, ;
কর যত্ন হবে জয়, জীবত্মা অনিত্য নয়,
ওহে জীব কর আকিঞ্চন।
ক'রো না সুখের আশ প'রো না দুখের ফাঁস,
জীবনের উদ্দেশ্য তা নয় ;
সংসারে সংসারী সাজ, করো নিত্য নিজ কাজ,
ভবের উন্নতি যাতে হয়।
দিন যায় ক্ষণ যায়, সময় কাহারো নয়,
বেগে ধায় নাহি রহে স্থির,—
সহায় সম্পদ বল সকলি ঘুচায় কাল
আয়ু যেন শৈবালের নীর।
সংসার সমরাঙ্গনে যুদ্ধ কর দৃঢ়পণে,
ভয়ে ভীত হয়ো না মানব !
কর যুদ্ধ বীর্য্যবান, যায় যাবে যাক প্রাণ,
মহিমাই জগতে দুর্ল'ভ।
মহাজ্ঞানী মহাজন, যে পথে করে গমন
হয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়,

সেই পথ লক্ষ্য করে স্বীয় কীর্ত্তি ধ্বজা ধরে,
আমরাও হব বরণীয়।
সময়-সাগর-তীরে পদাঙ্ক অঙ্কিত ক'রে
আমরাও হব হে অমর ;
সেই চিহ্ন লক্ষ্য ক'রে অন্য কোন জন পরে,
যশোদ্বারে আসিব সত্বর।

অনুশীলনী

১। (ক) 'বলো না কাতর স্বরে'—কবি কি বলিতে নিষেধ করিয়াছেন ?
(খ) 'ব'লে জ ব করো না ক্রন্দন'—কবি কি বলিয়া কাঁদিতে নিষেধ করিয়াছেন ?

২। (ক) 'এমন পাবে না আর'—কি পাইবে না ? কে পাইবে না ?
(খ) 'জীবনের উদ্দেশ্য তা নয়'—কাহার জীবনের কি উদ্দেশ্য নয় ?

৩। নিম্নলিখিত বাক্য বা বাক্যাংশগুলির সারাংশ সরল গদ্যে লিখ :—
(ক) এ জীবন নিশার স্বপন।
(খ) জীবাত্মা অনিত্য নয়।
(গ) আয়ু যেন শৈবালের নীর।

৪। 'আমরাও হব বরণীয়'—কি ভাবে বুঝাইয়া বল।

৫। শূন্যস্থানগুলি উপযুক্ত শব্দ দ্বারা পূর্ণ কর :—
(ক) ক'রো না সুখের —, প'রো না — ফাঁস।
(খ) সংসারে — সাজো, করো — নিজ কাজ।
(গ) দিন যায়, — যায়, সময় — নয়, বেগে — নাহি রহে স্থির।

৬। অর্থ বল :—
দারা, বহু, জীবাত্মা, অনিত্য, আকিঞ্চন, ভব, শৈবাল, বীর্যাবান, মহাজ্ঞানী, প্রাতঃস্মরণীয়, কীর্ত্তি-ধ্বজা, বরণীয়, পদাঙ্ক, সত্বর।

৭। সন্ধি বিচ্ছেদ কর :—
জীবাত্মা, সময়াঙ্গন, পদাঙ্ক।

৮। বিপরীত শব্দ বল :—
কাতর, জীবন, পুত্র, জয়, অনিত্য, সহায়, দুর্লভ।

মানুষ মরণশীল। জীবন ক্ষণস্থায়ী। চলার পথে পদে পদে বাধা—তাতে ভয় পাবার কিছু নেই। মহাজ্ঞানী মহাজনেদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সংসার সমরে অবিচলিত চিত্তে এগিয়ে গেলে মরণশীল জীবও কর্মের মাধ্যমে অমরত্ব লাভ করতে পারে। কবি জীবনের প্রকৃত সত্যের প্রকাশের জন্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছেন এখানে।

বিদ্যাসাগর

মাইকেল মধুসূদন দত্ত



বিদ্যার সাগর তুমি, বিখ্যাত ভারতে।
করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে,
দীন যে, দীনের বন্ধু!—উজ্জ্বল জগতে
হিমাদ্রির হেম-কান্তি অম্লান কিরণে।
কিন্তু ভাগ্যঃবলে পেয়ে সে মহাপর্বতে
যে জন আশ্রয় লয় সুবর্ণ-চরণে,
সেই জানে, কত গুণ ধরে কত মতে
গিরীশ। কি সেবা তার সে সুখ-সদনে!—
দানে বারি নদীরূপা বিমলা কিঙ্করী;
যোগায় অমৃত-ফল পরম আদরে
দীর্ঘশিরঃ তরু-দল, দাসরূপ ধরি;
পরিমলে ফুল-কুল দশ-দিশ ভরে,
দিবসে শীতল-শ্বাসী ছায়া বনেশ্বরী,
নিশায় সুশান্ত নিদ্রা, ক্লান্তি দূর করে!

অনুশীলনী

১। 'করুণার সিন্ধু তুমি'—কাহাকে বলা হইয়াছে? কবি তাঁহাকে আবার 'দীনের বন্ধু' বলিয়াছেন কেন?

২। নিম্নলিখিত বাক্য বা বাক্যাংশগুলির সারাংশ সরল গদ্যে লিখ:—

(ক) হিমাদ্রির হেম-কান্তি অম্লান কিরণে।

(খ) কত গুণ ধরে কত মতে গিরীশ।

(গ) কি সেবা তার সে সুখ সদনে!

(ঘ) দানে বারি নদীরূপা বিমলা কিঙ্করী।

(ঙ) পরিমলে ফুল-কুল দশ-দিশ ভরে।

(চ) দিবসে শীতল-শ্বাসী ছায়া বনেশ্বরী।

৩। প্রত্যেকটির তিনটি করিয়া সমনাম শব্দ বল:—

সাগর, পর্বত, চরণ, সদন, নদী, তরু, নিশা।

৪। বিপরীত শব্দ বল:—

বিদ্যা, বিখ্যাত, বন্ধু, উজ্জ্বল, আশ্রয়, গুণ, দীর্ঘ, দিবস।

৫। পদ নির্ণয় কর:—

তুমি, ভারত, দীন, হেম, সে, তার, বারি, ধরি ছায়া।

৬। বাক্য গঠন কর:—

বিখ্যাত, দীন, কিন্তু, ভাগ্য, সেবা, আদর, দল, কুল, ক্লান্তি।

৭। শূন্যস্থান উপযুক্ত শব্দ দ্বারা পূর্ণ কর:—

(ক) সেই জানে মনে, দীন যে,—।

(খ) —ভাগ্য-বলে পেয়ে সে;—।

(গ) যে জন আশ্রয় লয় —।

(ঘ) যোগায় — ফল — আদরে।

(ঙ) দীর্ঘ শিরঃ — দাসরূপ —।

কবি পুণ্যশ্লোক বিদ্যাসাগরের নানাবিধ গুণের কথা এখানে বর্ণনা করেছেন, দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরের প্রতি কবির এই শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন উভয়কেই চিনে নিতে সাহায্য করে।

আমার দেশ

—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

বঙ্গ আমার! জননী আমার! ধাত্রি আমার! আমার দেশ!
কেন গো মা তোর শুষ্ক নয়ন, কেন গো মা তোর রুক্ষ কেশ?
কেন গো মা তোর ধূলায় আসন, কেন গো মা তোর মলিন বেশ?
সপ্ত কোটি সন্তান যার ডাকে উচ্চে—"আমার দেশ"।
উদিল যেখানে বুদ্ধ-আত্মা মুক্ত করিতে মোক্ষ-দ্বার,
আজিও জুড়িয়া অর্ধ জগৎ ভক্তি প্রণত চরণে যাঁর,
অশোক যাঁহার কীর্তি ছাইল গান্ধার হতে জলধি-শেষ,
তুই কিনা মাগো তাঁদের জননী, তুই কিনা মাগো তাঁদের দেশ।
একদা যাহার বিজয়-সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়
একদা যাহার অর্ণবপোত ভ্রমিল ভারত-সাগরময়,
সন্তান যার তিব্বত-চীন-জাপানে গঠিল উপনিবেশ,
তার কিনা এই ধূলায় আসন, তার কিনা এই ছিন্নবেশ!
উঠিল যেখানে মুরজমন্দ্রে নিমাই কণ্ঠে মধুর তান,
ন্যায়ের বিধান দিল রঘুমণি, চণ্ডীদাস যেথা গাহিল গান,
যুদ্ধ করিল প্রতাপাদিত্য, তুই তো মা সেই ধন্য দেশ!
ধন্য আমরা, যদি এ শিরায় থাকে তাঁদের রক্ত-লেশ।
যদিও মা তোর দিব্য আলোকে ঘিরে আছে আজ আঁধার ঘোর
কেটে যাবে মেঘ, নবীন গরিমা ভাতিবে আবার ললাটে তোর,
আমরা ঘুচাব মা তোর দৈন্য, মানুষ আমরা নহি তো মেষ!
দেবি আমার! সাধনা আমার! স্বর্গ আমার। আমার দেশ!
কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ!
সপ্তকোটি মিলিত কণ্ঠে ডাকে যখন—"আমার দেশ"।

অনুশীলনী

১। কবি 'আমার দেশ' বলিতে কোন্ দেশকে বুঝাইয়াছেন ? সেই দেশকে তিনি 'জননী' ও 'ধাত্রী' বলিয়াছেন কেন ?

২। কবি 'আমাদের দেশ' এ জননীর কিরূপ বর্ণনা দিয়াছেন বল।

৩। 'আজিও জুড়িয়া অর্ধ জগৎ ভক্তি প্রণত চরণে যাঁর'—কাহার চরণে ? 'অশোক যাঁহার কীর্তি ছাইল'—কাহার কীর্তি, 'একদা যাহার বিজয়-সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়'—কাহার সেনানী ? 'একদা যাহার অর্ণবপোত ভ্রমিল'—কোথায় ভ্রমিল ?

৪। শূন্যস্থান উপযুক্ত শব্দদ্বারা পূর্ণ কর :—

উঠিল যেখানে মুরজমন্দ্রে — কণ্ঠে মধুর তান,
ন্যায়ের বিধান দিল —, — যেথা গাহিল গান,
যুদ্ধ করিল —, তুই তো মা সেই ধন্য —।

৫। 'আমরা ঘুচাব মা তোর দৈন্য'—কি ভাবে বল ?

৬। (ক) কে বল — বুদ্ধ, অশোক, নিমাই, রঘুমণি, চণ্ডীদাস, প্রতাপাদিত্য।

(খ) কোথায় বল — গান্ধার, ভারত-সাগর, লঙ্কা, তিব্বত, চীন, জাপান।

৭। কবিতাটি আবৃত্তি কর (সমবেত ভাবে)

৮। গদ্যরূপ লিখ—

উদিল, ছাইল, হতে, ভ্রমিল, ভাতিবে।

৯। শুদ্ধ করিয়া লিখ :—

শুক্ত, রুক্ষ, মক্ষ, কীর্তি, জলধী, অর্নব, উপনিবেশ, দিব্ব।

১০। অর্থ বল :—

মলিন, বেশ, সেনানী, অর্ণব, ছিন্নবেশ, মুরজমন্দ্র, দিব্য, সাধনা।

বঙ্গজননীর বর্তমান দীনা অবস্থায় কবি ব্যথিত। দেশপ্রেমিক কবি বঙ্গমায়ের অতীতকে স্মরণ করে তিনি যে রত্ন-প্রসবিনী তা জানিয়ে দেশবাসীকে মায়ের যথার্থ রূপ প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ করেছেন। অসাধারণ দেশপ্রেমমূলক কবিতা এটি।

পাছে লোকে কিছু বলে

—কামিনী রায়

করিতে পারি না কাজ,
সদা ভয়, সদা লাজ,
সংশয়ে সংকল্প সদা টলে,
পাছে লোকে কিছু বলে !

আড়ালে আড়ালে থাকি,
নীরবে আপনা ঢাকি,
সম্মুখে চরণ নাহি চলে,
পাছে লোকে কিছু বলে !

হৃদয়ে বুদ্‌বুদ্‌ মত
উঠে শুভ্র চিন্তা কত,
মিশে যায় হৃদয়ের তলে,
পাছে লোকে কিছু বলে !

কাঁদে প্রাণ যবে, আঁখি
সযতনে শুষ্ক রাখি,
নিরমল নয়নের জলে,
পাছে লোকে কিছু বলে !

একটি স্নেহের কথা
প্রশমিতে পারে ব্যথা—
চ'লে যাই উপেক্ষার ছলে,
পাছে লোকে কিছু বলে !

মহৎ উদ্দেশ্যে যবে
এক সাথে মিলে সবে,
পারি না মিলিতে সেই দলে,
পাছে লোকে কিছু বলে!
বিধাতা দেছেন প্রাণ,—
থাকি সদা ম্রিয়মাণ
শক্তি মরে ভীতির কবলে,
পাছে লোকে কিছু বলে!

মানুষ অনন্ত শক্তির অধিকারী, অথচ লোকলজ্জায়, সংকোচে সে অনেক সময় অনন্ত কর্মে নিজেকে নিযুক্ত করে না। মিথ্যা লোক-লজ্জার সংকোচ— যা আমাদের আত্মশক্তি স্ফুরণের পথে প্রধান

অনুশীলনী

১। 'করিতে পারিনা কাজ, সদা ভয়, সদা লাজ'—কেন কাজ করিতে পারিনা? কিসের ভয় ও লজ্জা বল।

২। (ক) 'সম্মুখে চরণ নাহি চলে'—কাহার চরণ কেন চলে না?
(খ) 'মিশে যায় হৃদয়ের তলে'—কি মিশে যায় এবং কেন?
(গ) 'সযতনে শুষ্ক রাখি'—কি শুষ্ক রাখি এবং কেন?
(ঘ) 'একটি স্নেহের কথা' কি করিতে পারে, অথচ তাহার বদলে কি করি?

৩। (ক) 'পারিনা মিলিতে সেই দলে'—কোন্ দলে কেন মিলিতে পারি না বল।
(খ) 'থাকি সদা ম্রিয়মান'—কে থাকে এবং কেন?

৪। অর্থ বল ও বাক্য গঠন কর :—
সংশয়, সংকল্প, বুদ্বুদ, শুভ্র, উপেক্ষা, ম্রিয়মান, কবল।

৫। গদ্যরূপ লিখ :—
নিরমল, প্রশমিতে, দেছেন।

৬। পদ নির্ণয় কর :—
টলে, আঁখি, চিন্তা, কণা, ভীতি।

৭। কবিতাটি আবৃত্তি কর (একক ভাবে/সমবেত ভাবে)।

অন্তরায় — তাকে অস্বীকার করে আদর্শপথে নির্ভীকভাবে অগ্রসর হতে কবি উপদেশ দিয়েছেন,



বাংলাভাষা

—অতুলপ্রসাদ সেন

মোদের গরব, মোদের আশা
আ মরি, বাংলা ভাষা !
(ওগো) তোমার কোলে, তোমার বোলে,
কতই শান্তি ভালবাসা !

কি জাদু বাংলা গানে !
গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে !
গেয়ে গান নাচে বাউল,
গান গেয়ে ধান কাটে চাষা।

ঐ ভাষাতেই নিতাই-গোরা
আনল দেশে ভক্তিধারা ;
আছে কই এমন ভাষা
এমন দুঃখ-ক্লান্তি-নাশা।

বাজিয়ে রবি তোমার বীণে
আনল মালা জগৎ জিনে ;
তোমার চরণ-তীর্থে মাগো,
জগৎ করে যাওয়া-আসা।

ঐ ভাষাতেই প্রথম বোলে,
ডাকনু মায়ে 'মা' 'মা' বলে,
ঐ ভাষাতেই বলব 'হরি'
সাঙ্গ হলে কাঁদা-হাসা !

অনুশীলনী

১। কবির নিকট বাংলা ভাষা কেন 'মোদের গরব, মোদের আশা' ?

২। বাংলা গানের 'জাদু' কাহাকে কি ভাবে উৎসাহ দেয় বল ?

৩। (ক) কে কোন্ ভাষাতে 'আনল দেশে ভক্তিধারা' ?
(খ) কে কোন্ ভাষাতে 'আনল মালা জগৎ জিনে' ?

৪। 'ঐ ভাষাতেই প্রথম বোলে'—কোন্ ভাষাতে 'প্রথম বোলে' কি বলি ? এই ভাষাতে শেষ বোলেই বা কি বলি ?

৫। নিম্নলিখিত বাক্য বা বাক্যাংশগুলির সারাংশ সরল গদ্যে লিখ—

(ক) (ওগো) তোমার কোলে, তোমার বোলে,
কতই শান্তি ভালবাস।

(খ) বাজিয়ে রবি তোমার বীণে
আনল মালা জগৎ জিনে।

(গ) তোমার চরণ-তীর্থে মাগো
জগৎ করে যাওয়া-আসা।

(ঘ) ঐ ভাষাতেই বলব 'হরি'
সাঙ্গ হলে কাঁদা-হাসা।

৬। গদ্যরূপ বল—
মোদের, গরব, জিনে, ডাকনু।

৭। বাংলা ভাষায় কে কোন্ ক্ষেত্রে বিখ্যাত হইয়াছেন বল :—
নিতাই, গোরা, রবি—ধর্মে/সঙ্গীতে/সাহিত্যে।

৮। কবিতাটি আবৃত্তি কর (সমবেত ভাবে)।

এটি মাতৃভাষার যশোগাথা জয়গাথা। এখানে বাংলাভাষার প্রতি পরিসীম মমত্ব ফুটে উঠেছে। দেশপ্রেমের সঞ্চারে এর ভূমিকা অসামান্য।

বর্ষায়

—করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রামে ঢোকে জল, গাঙে নামে ঢল,
আকাশের কোলে কোমল কাজল,
এসেছে বরষা বড় চঞ্চল—বড় দুরন্ত মেয়ে।
ডুবে গেছে মাঠ, গঞ্জের ঘাট,
অশথের তলে বসে নাক হাঠ,
সারা দিনরাত বৃষ্টির ছাট ঝরিতেছে একঘেয়ে ।।
ভাসিল পুকুর, আউশের ভূঁই,
পালায় কাত্‌লা কালবোস রুই,
আঙ্গিনায় জল করে ছল ছল, কই যায় কানে হেঁটে।
কাঁঠালি চাঁপার তীব্র সুবাস ;
মাতাল করেছে বাদল বাতাস ;
গাছভরা জাম সুচিকন শ্যাম রসে পড়ে যেন ফেটে ।।
ভিজে ভিজে নীড় বুনিছে বাবুই,
ঝাপটে ঝটিকা ছুটিঝে হাউই—
চ'লে গেছে চিল, গগনের নীল গ'লে গেছে জল-ধারে।
রাঙা আঁখি-মেলি আনারস-রাজ
পরিয়াছে শিরে মরকত-তাজ ;
নেবুর কুঞ্জে মধুর গন্ধ চন্দন-দীঘি-পারে ।।
যুথী-মালঞ্চে ফুল ছড়াছড়ি
মুকুতার পাঁতি যায় গড়াগড়ি
ধূলা-কাদা-মাখা পাপড়িতে ঢাকা কামিনী তরুর তলা।
দূর নির্জনে তমালের ডালে
শ্যামল মালতী সুধাধারা ঢালে
বন-ভ্রমরের শুরু হল আজ সেই দিকে পথ চলা ।।

অনুশীলনী

১। ‘এসেছে বরষা বড় চঞ্চল’—তাহার ফলে মাঠ-ঘাট-হাটের কি অবস্থা হইয়াছে বল ?

২। কবি ‘বড় দুরন্ত’ কিসের সহিত বর্ষার তুলনা করিয়াছেন ? ‘সারা দিন রাত বৃষ্টির’ ফলে পুকুর-ভুঁই-আঙিনার কি দশা বল ?

৩। (ক) ‘মাতাল করেছে বাদল বাতাস’—কে কিসে মাতাল করিয়াছে ?

(খ) ‘রসে পড়ে যেন ফেটে’—কি পড়ে ?

(গ) ‘সেই দিকে পথ চলা’—কোন্ দিকে, কাহার চলা ?

৪। নিম্নলিখিত বাক্যগুলির সারাংশ সরল গদ্যে লিখ।

(ক) ‘গগনের নীল গ’লে গেছে জল-ধারে।’

(খ) ‘রাঙা আঁখি-মেলি আনারস রাজ
পরিয়াছে শিরে মরকত তাজ।’

(গ) ‘যূথী-মালঞ্চে ফুল ছড়াছড়ি
মুকতার পাঁতি যায় গড়াগড়ি।’

৫। শূন্যস্থানগুলি উপযুক্ত শব্দ দ্বারা পূর্ণ কর :—

(ক) আকাশের কোলে —— কাজল, (খ) কাঁঠালী চাঁপার তীব্র ——, (গ) ভিজে ভিজে —— বুনিছে বাবুই, (ঘ) ঝাপটে ঝটিকা ছুটিছে —— (ঙ) নেবুর কুঞ্জে —— গন্ধ —— দীঘি পারে।

৬। অর্থ বল ও বাক্য গঠন কর :—

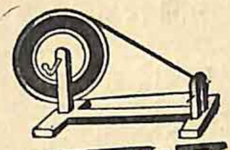
কোমল, চঞ্চল, আঙ্গিনা, সুবাস, সুচিকন, নীড়, ঝটিকা, মরকত, মালঞ্চ, সুধা।

৭। প্রত্যেকটির তিনটি করিয়া সমনাম শব্দ বল।

আকাশ, পুকুর, আঙ্গিনা, আঁখি, শির।

৮। কবিতাটি আবৃত্তি কর।

কবি এখানে বর্ষার একটি রেখাচিত্র অঙ্কন করেছেন। বর্ষার আবির্ভাবে প্রকৃতিজগতে ও গ্রামীণ রূপে যে পরিবর্তন আসে তার সহজ, সুন্দর, কাব্যিক বিবরণ এটি।



চরকার গান

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

ভোমরায় গান গায় চরকায়, শোন্ ভাই ?
খেই নাও পাঁজ দাও, আমরাও গান গাই !
ঘর-বা'র করবার দরকার নেই আর,
মন দাও চর্কায় আপ্নার আপ্নার।
চরকার ঘর্ঘর পড়্শীর ঘর-ঘর !
ঘর-ঘর ক্ষীর-সর—আপনার নির্ভর !
পড়্শীর কণ্ঠে জাগ্ল সাড়া,
দাঁড়া আপনার পায়ে দাঁড়া।

চরকায় সম্পদ, চরকায় অন্ন,
বাংলার চরকায় ঝল্কায় স্বর্ণ !
বাংলার মস্লিন্ বোগ্দাদ রোম্ চীন
কাঞ্চন-তৌলেই কিনতেন একদিন।
চরকার ঘর্ঘর শ্রেষ্ঠীর ঘর-ঘর,
ঘর-ঘর সম্পদ—আপ্নার নির্ভর !
সুপ্তের রাজ্যেই দৈবের সাড়া,
দাঁড়া আপ্নার পায়ে দাঁড়া,

চরকাই লজ্জার-সজ্জার বস্ত্র !
চরকাই দৈন্যের সংহার- অস্ত্র,

চরকাই সন্তান ! চরকাই সম্মান !
চরকাই দুঃখীর দুঃখের শেষ ত্রাণ !
চরকাই ঘর্ঘর বঙ্গের ঘর-বর !
ঘর-ঘর সম্ভ্রম—আপ্‌নার নির্ভর !
প্রত্যাশা ছাড়াবার জাগল সাড়া,
দাঁড়া আপ্‌নার পায়ে দাঁড়া !

কবিতাটির ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। ব্রিটিশ-শোষণের বিরুদ্ধে চরকা একটি হাতিয়ার, চরকার মাধ্যমে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং সচ্ছলতা যে লাভ করা যায় কবি তা দেখিয়েছেন। দেশপ্রেমই এর মূল কথা।

অনুশীলনী

১। (ক) 'ঘর-বার করবার দরকার নেই আর'—কেন ?
(খ) 'পড়শীর কণ্ঠে জাগল সাড়া'—কি ভাবে ?
(গ) 'চরকাই দৈন্যের সংহার অস্ত্র'—কেন ?
(ঘ) 'চরকাই সন্তান ! চরকাই সম্মান !'—কি ভাবে ?

২। নিম্নলিখিত বাক্য বা বাক্যাংশগুলির সারাংশ সরল গদ্যে লিখ :—
(ক) 'খেই নাও, পাঁজ দাও, আমরাও গান গাই।'
(খ) 'চরকায় সম্পদ, চরকায় অন্ন
বাংলার চরকায় ঝল্‌কায় স্বর্ণ !'
(গ) 'বাংলার মস্‌লিন্ বোগদাদ রোম চীন
কাঞ্চন তৌলেই কিন্‌তেন একদিন।'
'প্রত্যাশা ছাড়বার জাগল সাড়া,
দাঁড়া আপ্‌নার পায়ে দাঁড়া।'

৩। অর্থ বল ও বাক্য গঠন কর :—
সম্পদ, স্বর্ণ, কাঞ্চন, তৌল, শ্রেষ্ঠী, সুপ্ত, সংহার, প্রাণ, সম্ভ্রম।

৪। বোগ্‌দাদ, রোম, চীন—কোথায় বল।

৫। কবিতাটি অবৃত্তি কর।

গাহি সত্যের জয়

—কালিদাস রায়

মোরা—গাহি সত্যের জয়,
সদা—বরিব সত্যে স্মরিব সত্য, দূরিব মিথ্যা ভয় ॥
সহি'—সকল দুঃখতাপ
মোরা—ঘুচাব ভ্রান্তি পাপ,
মোরা—বরিয়া বেদনা তপের সাধনা মুছাব জাতীয় শাপ
মোরা—শির পাতি' লব' সকল দণ্ড অপরাধ যদি হয় ॥
মোরা—রাখিনে ন্যায়ের মান
হেসে—সকলি করিব দান,
মোরা—ভোগ বিলাসের শফরী-লীলায় হ'ব না দুহ্যমান।
হীন—স্বার্থের সাথে মনুষ্যত্ব করিব না বিনিময় ॥
হ'ব—জীবন সমরে শূর,
হীন—জড়তা করিব দূর,
মোরা—হেরি' মিথ্যার আপাত-বিজয় হ'ব না শঙ্কাতুর।
মোরা—রুদ্রের শূলে ভয় করিব না, কেড়ে ল'ব বরাভয় ॥

অনুশীলনী

১। কি ভাবে আমরা 'মিথ্যা ভয়' দূর করিব? কি ভাবে 'ভ্রান্তি পাপ' ঘুচাইব?

২। কি রূপে আমরা 'ন্যায়ের মান' রাখিব? কিরূপে 'হীন-জড়তা' দূর করিব?

৩। নিম্নলিখিত বাক্য ও বাক্যাংশগুলির সারাংশ সরল গদ্যে লিখ :—

(ক) 'মোরা-বরিয়া বেদনা তপের সাধনা মুছাব জাতীয় শাপ।'

(খ) 'মোরা-ভোগ বিলাসের শফরী-লীলায় হ'ব না মুহ্যমান।'

(গ) 'হীন—স্বার্থের সাথে মনুষ্যত্ব করিব না বিনিময়।'

(ঘ) 'মোরা—হেরি, মিথ্যার আপাত-বিজয় হব না শঙ্কাতুর।'

৪। অর্থ বল ও বাক্য গঠন কর :—

দুঃখতাপ, ভ্রান্তি, মুহ্যমান, মনুষ্যত্ব, শঙ্কাতুর, শূর, রুদ্র, বরাভয়।

৫। গদ্যরূপ লিখ :—

বরিব, স্মরিব, দূরিব, বরিয়া, হেরি।

৬। বিপরীত শব্দ লিখ :—

সত্য, জয়, ভয়, পাপ, শাপ, ন্যায়, স্বার্থ, জীবন, সমর।

৭। পদ নির্ণয় কর :—

স্মরিব, সাধনা, বিলাস, জড়তা, রুদ্র।

৮। সন্ধি বিচ্ছেদ কর :—

শঙ্কাতুর, বরাভয়।

৯। কবিতাটি আবৃত্তি কর (সমবেত ভাবে/একক ভাবে)।

কবি সত্যাশ্রয়ী, সৎপ্রাণী পুরুষ হতে চেয়েছেন। মনুষ্যত্বই কবির সাধনা। বাহ্য ভোগলীলায় মেতে না উঠে জাতীয় অভিশাপ দূর করতে, সত্য প্রতিষ্ঠায় তিনি কৃতসঙ্কল্প। কবিতাটিতে আদর্শবাদ ব্যক্ত হয়েছে।

থাকব নাক

—কাজী নজরুল ইসলাম

থাক্‌ব নাক' বদ্ধ ঘরে, দেখব এবার জগৎটাকে,
কেমন করে ঘুরছে মানুষ যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে।
দেশ হ'তে দেশ দেশান্তরে ছুটছে তারা কেমন ক'রে
কিসের নেশায় কেমন ক'রে মরতেছে বীর লাখে লাখে,
কিসের আশায় করছে তা'রা বরণ মরণ-যন্ত্রণাকে।

কেমন করে বীর-ডুবুরী সিন্ধু ছেঁচে মুক্তা আনে,
কেমন ক'রে দুঃসাহসী চল্‌ছে উড়ে স্বর্গপানে।
জাপ্‌টে ধরে ঢেউয়ের ঝুঁটি যুদ্ধ জাহাজ চলছে ছুটি,
কেমন ক'রে আন্‌ছে মাণিক, বোঝাই ক'রে সিন্ধু-যানে।
কেমন জোরে টানলে সাগর উথ্‌লে উঠে জোয়ার-বানে।

কেমন ক'রে ম'থলে পাথর লক্ষী উঠেন পাতাল ফুঁড়ে,
কিসের অভিযানে মানুষ চলছে হিমালয়ের চু'ড়ে,
তুহিন-মেরু পার হ'য়ে যায় সন্ধানীরা কিসের আশায়
হাউই চ'ড়ে চায় যেতে কে চন্দ্রালোকের অচিন পুরে,—
শুন্‌ব আমি ইঙ্গিত কোন্ মঙ্গল হ'তে আসছে উড়ে।

রইব নাক' বদ্ধ খাঁচায়, দেখব এসব ভুবন ঘুরে,'
আকাশ-বাতাস-চন্দ্র তারায় সাগর-জলে পাহাড়-চুড়ে।
আমার সীমার বাঁধন টুটে' দশ দিকেতে পড়্‌ব লুটে,
পাতাল ফেড়ে' নামব নীচে, উঠব আমি আকাশ ফুঁড়ে'
বিশ্ব-জগৎ দেখব আমি আপন হাতের মুঠোয় পুরে'।

অনুশীলনী

১। (ক) 'থাকব নাক' বদ্ধ ঘরে'—কে থাকিবে না, কেন ?
(খ) 'দেখব এবার জগৎটাকে'—কে দেখিবে, কি ভাবে ?

২। কেমন করিয়া মানুষ ঘুরিতেছে ? কেমন করিয়া তাহারা ছুটিতেছে ?

৩। লাখে লাখে বীর কি করিতেছে ? বীর-ডুবুরী কি আনে ? দুঃসাহসী কোথায় চলিতেছে ? সিন্ধু যাম কি বোঝাই করিয়া আনে ? সন্ধানীরা কি পার হইয়া যায় ?

৪। 'দেখব এসব ভুবন ঘুরে'—কে কি সব দেখবে বল।

৫। শূন্যস্থানগুলি উপযুক্ত শব্দ দ্বারা পূর্ণ কর :—
(ক) কিসের আশায় করছে তা'রা বরণ — যন্ত্রণাকে।
(খ) — ধ'রে ঢেউয়ের ঝুঁটি — যুদ্ধ — চল্‌ছে ছুটি।
(গ) কেমন জোরে টান্‌লে সাগর — উঠে জোয়ার —।
(ঘ) কেমন করে — পাথার — উঠেন পাতাল ফুঁড়ে।
(ঙ) — চড়ে চায় যেতে কে — অচিন পুরে — শুনব আমি ইঙ্গিত কোন্ — হ'তে — উড়ে।

৬। অর্থ বল :—
ছেঁচে, উথাল, ম'থলে, ফুঁড়ে, তুহিন, সন্ধানী, ইঙ্গিত, ভুবন, সীমা।

৭। 'রইব নাক' বদ্ধ খাঁচায়······' এই গান হইতে কবিতাটি শেষ পর্যন্ত উদ্ধৃত কর এবং এই অংশের মূল কথা সরল গদ্যে লিখ।

৮। প্রত্যেকটির তিনটি করিয়া সমনাম শব্দ বল :—
জগৎ, সিন্ধু, আকাশ, বাতাস, চন্দ্র, পাহাড়।

৯। কবিতাটি আবৃত্তি কর (একক ভাবে)।

অজানাকে জানা, অচেনাকে চেনা, অদেখাকে দেখার এবং অলব্ধকে লাভ করার দুর্বার বাসনা মানুষের মধ্যে নিত্য বিরাজমান। কবি তারই বন্দনাগান করেছেন এখানে।